স্বদেশ সংহতি সংবাদ

হিন্দু সংহতি

পূজা সংখ্যা আশ্বিন, ১৪২২, অক্টোবর ২০১৫

স্বদেশ

সংহতি সংবাদ

সাহস ✪ শক্তি ✪ সক্রিয়তা

বিশেষ পূজা সংখ্যা ২০১৫ (আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ)

হিন্দু সংহতি

সম্পাদক
সমীর গুহরায়

প্রকাশক ও মুদ্রক
তপন কুমার ঘোষ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা-৭০০০১২
ফোন ঃ ৭৪০৭৮১৮৬৮৬

মুদ্রণে
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬

প্রাপ্তিস্থান
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য-১৬ টাকা

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি
<www.hindusamhati.net>,
<hindusamhatibangla.com>
<www.hindusamhatitv.blogspot.in>,
Email : hindusamhati@gmail.com

সূচীপত্র

আমাদের কথা		২
বাঙালি হিন্দু এসি কারেন্ট	তমাল দাশগুপ্ত	৩
ব্যক্তিগত উদ্যমেরও দরকার আছে	দেবতনু ভট্টাচার্য্য	১১
সংস্কৃত সমস্ত ভারতীয় ভাষার জননী	অমিত মালি	১২
আমার প্রশ্নটা একটু বিচিত্র	নিহারণ প্রহারণ	১৩
তৃতীয় আমেরিকা সফর	তপন ঘোষ	১৬
ঈদের কুরবানী হিন্দুর হয়রানি	নিজস্ব প্রতিবেদন	২১
ডাক্তারবাবু	সমীর গুহরায়	২২
অশরীরী	পবিত্র রায়	২৫
বিনিকে ভালোবেসে	অম্বিকা গুহরায়	৩৩
মুক্তির দূত	ডঃ অরুণ কুমার গিরি	৩৭
পত্রিকা দপ্তর থেকে		৩৯

কবিতা

একটি অবাস্তব প্রেমের গল্প	সুন্দরগোপাল দাস	১৫
গ্রহণ	সমীর গুহরায়	৩৮

আমাদের কথা

আমার দীর্ঘ সামাজিক কর্মজীবনে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বহু গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করে পাওয়া অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে বাঙালিদের মধ্যে যত জাতি বা গোষ্ঠী আছে, তার মধ্যে বেশিরভাগই খুব সাহসী জাতি। তারা যুঝারু ও যোদ্ধা জাতি। কিন্তু তারা প্রায় সবাই আর্থিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া বলে সামাজিক ঐক্যমত নির্মাণে বা সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। এছাড়া এই জাতিগুলি বিদেশী মুসলমান ও ইংরাজ শাসকদের সহযোগী বা দোসর ছিল না বলে তারা সাহসী শক্তিশালী ও যোদ্ধা জাতি হলেও তাদের অবস্থান দুর্বল ছিল। সেই কারণেও তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সেই বিদেশী শাসনের সময় থেকেই গোটা সমাজের হয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে উচ্চশ্রেণি, উচ্চবর্গ ও উচ্চবর্ণের মানুষরা যাদের বেশিরভাগ অংশই সুবিধাভোগী শ্রেণি। স্বভাবতই এরা সুখী এবং ভীরু। তাই তারা ভীরু সিদ্ধান্ত নেয়। শক্তিশালীর সামনে সহজেই মাথা নত করে, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে ও অন্যায় দাবির সঙ্গে সমঝোতা করে নেয়। সেইজন্যই গোটা বাঙালি জাতিকে ভীরু ও কাপুরুষ মনে হয়।

যেদিন থেকে আমাদের বাঙালি সমাজের সাহসী ও যোদ্ধা জাতিগুলি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে সেদিন থেকে গোটা চিত্রটা পাল্টে যাবে। পৃথিবী অন্য এক বাঙালি-কে দেখবে। সেই দিনকে এগিয়ে আনার জন্য সবাই চেষ্টা করুন। তবেই এই বঙ্গকে আরবী সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী থাবা থেকে বাঁচানো যাবে।

বাঙালি হিন্দু এসি কারেন্ট

ডঃ তমাল দাশগুপ্ত
অধ্যাপক, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

১
বাঙালির শেকড়

বাঙালি হিন্দুকে কেউ আর ভয় পায় না। সে-ই বরং সবাইকে ডরায় আজকাল। সে একসময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব হিয়েছিল, আজ নিজভূমে পরবাসী হয়ে চলেছে। এহেন বাঙালি হিন্দু কে এসি কারেন্ট বলার মানে কি? তাকে ছুঁলে শক পাওয়া দূরে থাক, সে তো প্রায় বারোয়ারি পাঞ্চিং ব্যাগ হয়ে গেছে, যার ইচ্ছে সে-ই হাতের সুখ করে চলে যায় তার ওপরে।

আসলে এসি কারেন্ট কথাটায় একটা পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তি আছে (কারণ এসি মানেই অলটারনেটিং কারেন্ট, সেক্ষেত্রে এসি কারেন্ট বললে কারেন্ট কথাটা দুবার বলা হয়ে গেল) ভালো ইংরেজিতে যাকে বলে Tautology এবং ঠিক এই কারণেই বাঙালি হিন্দু হল এসি কারেন্টের সমগোত্রীয় (বাঙালির সঙ্গে এসি কারেন্টের আরও অন্যান্য প্যারালাল ভেবে বের করা যায়, তবে তা এই প্রবন্ধের আওতার বাইরে!)।

বাঙালি হিন্দু কথাটা একটা টটোলজি, কারণ বাঙালি বললে ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুই (অর্থাৎ দেশজ সংস্কৃতি ও ধর্মের অনুসারী) বুঝিয়েছে।

আগে, একটু পেছন ফিরে তাকাই।

পূর্বভারতের এই অঞ্চলে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলি আলাদা আলাদা নামে রাজত্বের উত্থান হয়েছে, অনেকগুলি ক্ল্যান বা জনগোষ্ঠীর সমাহার হল আজকের বাঙালি। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র সুহ্ম - পূর্বভারতের এই পাঁচটি পরাক্রান্ত রাজ্যের নাম আমরা পাচ্ছি সেই আদ্যিকাল থেকেই, এর মধ্যে তিনটিই সরাসরি আজকের বাঙালির উত্তরাধিকার। আবার তাম্রলিপ্ত ছিল পূর্ব ভারতের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর। আজকে যেখানে সিঙ্গুর, সেখানকার প্রাচীন নাম ছিল সিংহপুর, বিজয় সিংহ এখানকার যুবরাজ ছিলেন, তাঁকে নির্বাসিত করা হলে তিনি তাম্রলিপ্ত থেকেই সমুদ্রে পাড়ি দেন, এবং লঙ্কা জয় করে উপনিবেশ গড়েন, তাঁর নামে লঙ্কার নাম হয় সিংহল (এই কাহিনি আমরা সিংহলী গ্রন্থেই পাই, এবং জেনেটিক ও লিঙ্গুইস্টিক স্টাডির মাধ্যমে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে)। এই তাম্রলিপ্ত এক শক্তিশালী রাজ্য হিসেবেও গড়ে উঠেছিল। গঙ্গা ও সাগরের মোহনার কাছেই ছিল প্রবল পরাক্রান্ত গঙ্গাহৃদি (মতান্তরে গঙ্গারাঢ়ী) সাম্রাজ্য, যাকে টলেমি বলেছেন গঙ্গারিডি, যাদের বিশাল সৈন্যশক্তিতে ভয় পেয়ে আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী আর ভারতবিজয়ে অগ্রসর হতে চায়নি (এটা গ্রীকদের গ্রন্থিত ইতিহাসেই পাচ্ছি)। সম্ভবত বারাসাতের চন্দ্রকেতুগড়ে ছিল গঙ্গারিডিদের রাজধানী। আবার ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌখরীরাজ ঈশানবর্মার হড়াহা লিপিতে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়—গৌড়ান সমুদ্রশয়ান। আরও অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের ওপরে ভিত্তি করে মনে হয়, গৌড়সাম্রাজ্যের তখন একটি সমুদ্রতীরবর্তী শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল, এবং জলযুদ্ধে পটু পরাক্রান্ত নৌসেনা ছিল গৌড়ের। আবার, এখান থেকে দেড় হাজার বছর বা তারও বেশি পিছিয়ে গেলে পাচ্ছি গঙ্গা ও সাগরের মোহনায় কপিলমুনির আশ্রম, যেখানে সাংখ্য দর্শন রচিত হয়। প্রকৃতি-পুরুষ নির্ভর দ্বৈতবাদ সেই সাংখ্যের প্রধান অবদান বাঙালির আবহমানকালের মনন চিন্তনে। আমাদের বৌদ্ধ অতীতেও সেই সাংখ্যেরই স্পষ্ট ছাপ। মহাযানের শূন্য ও করুণা, বজ্রযানের তান্ত্রিক, সহজযানের সহজিয়া সাধন পদ্ধতিতে, এই বাঙালি জাতি সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিকেই বারবার খুঁজছে। এক আশ্চর্য বিবর্তনে আমাদের আজকের শাক্ত ঐতিহ্যে মা কালীর পায়ের তলায় শুয়ে থাকা শিব হলেন সাংখ্যেরই প্রকৃতি বিবর্তিত রূপ, বঙ্কিম থেকে শুরু করে দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সবাই তাই মনে করেছেন। এমনকি বৈষ্ণব থেকে আউলবাউল, সবার মধ্যেই ওই প্রকৃতি-পুরুষেরই লীলা দেখছি। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সপ্তডিঙা অনলাইন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় আমার লেখা পড়ে দেখতে পারেন।

এইখানে, এই সাংখ্যে বাঙালি জাতির প্রধানতম শেকড় (বাঙালি একটা জাতি, হিন্দু ভারত এক মহাজাতি, এভাবে দেখলে বোঝার সুবিধা হবে)। বাঙালির প্রধান উৎসব তাই দুর্গাপুজো, কারণ দুর্গাপুজো সাংখ্যের প্রকৃতিকেই উদ্‌যাপন করছে।

কিন্তু একটা পালটা বাঙালির ধারণাও আমরা পাই, যেটা সমস্ত মেইনস্ট্রিম পত্রপত্রিকায় আমাদের অনবরত গেলানো হয়ে থাকে। সেটা হল, বাঙালি হল তারাই যারা বাংলায় কথা বলেন। ব্যাস, আর কিছু না। কোনওরকম ইতিহাস যেন ব্যাগড়া

না বাধায়, সংস্কৃতিকে ছেঁটে ফ্যালো, বাঙালি পরিচয়ের সমস্ত ধর্মীয় অনুষঙ্গকে উড়িয়ে দাও, এবং তারপরে যে নির্বীজ, নিস্তেজ, 'এই-গরু-সরো-না' ধরণের শান্তিনিকেতনী ঝোলা কাঁধে বাঙালিকে পাওয়া যাবে, সে স্বভাবতই একটা তালপাতার সেপাই, নিতান্তই নিধিরাম সর্দার, সে সমস্ত আগ্রাসনের সামনে দাঁড়িয়ে তখন ভজগোবিন্দ কী রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে।

একটা জাতিকে মারতে গেলে, আগে তার মাথাটা ঘুলিয়ে দিতে হয়। অসুরদের যুদ্ধে হারানো মুশকিল ছিল, তাই তাদের মধ্যে চার্বাক দর্শনের প্রচার করা হল। বাঙালি ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারায়ণী সেনার মত অগ্রসর, সে একাধারে ইংরেজের ভীম ত্রাস এবং অর্জুন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল, তাই তাকে ধ্বংস করার জন্য অনেকগুলো আদর্শ ও বুলি বাজারে ছাড়া হয়। নিঃসন্দেহে আমাদের কমিউনিস্টরা পাখিপড়ার মত আন্তর্জাতিকতা কপচাতে কপচাতে ইংরেজের কোলে চেপে যে নাচনটা নেচেছিলেন, বা তারও আগে রবীন্দ্রনাথ যখন ঘরে বাইরে, চার অধ্যায় ইত্যাদি বিশ্বমানবিক উপন্যাসে বাঙালি বিপ্লবীদের এবং জাতীয়তাবাদের নেগেটিভ ছবি আঁকছেন, এগুলো সরাসরি বাঙালিকে দুর্বল করেছে। বাঙালির মধ্যে বামপন্থা ও রাবীন্দ্রিকতার প্রভাব আজ গভীর। এই লেফট ও লিবেরাল বিশ্বমানবিক/বিশ্ববিপ্লবী ঘরানাগুলো আমাদের জাতীয়তাবোধকে দুর্বল করেছে, সন্দেহ নেই।

২

ভাষাবাদের বকচ্ছপ মূর্তি ভ্যাষনালিজম

এই বিশ্বমানবিক, সংকীর্ণতামুক্ত বাঙালিয়ানার সংজ্ঞাই আজ শক্তিশালী। যার বলে, ঈদ হয়ে উঠেছে বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব, গরুর মাংস বাঙালির সবথেকে প্রিয় খাবার, আর মুজিবর রহমান হয়ে উঠেছেন হাজার বছরের বাঙালি জাতির সেরা বাঙালি। আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে নিয়মিত এসব দেখতে পাই। কারণ, আঁতেলরা তো বলেই দিচ্ছেন, বাঙালি মানে স্রেফ যে বাংলায় কথা বলে।

অথচ, বাঙালি বললে বরাবর হিন্দুই বুঝিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী। আজও পশ্চিমবাংলার গণমানুষের মধ্যে, যারা তথাকপিত শিক্ষিত বাবু বিবিদের মহলে ঘোরাফেরা করেন না, কফি হাউজে গিয়ে দেরিদা আর ফুকো চর্চা করেন না, তাদের কাছে, বাঙালি বললে কি বোঝায়, সেটা সবাই জানে।

সুনীলের "আমি কি বাঙালি" বইতে এক জায়গায় উল্লেখ আছে, যশোরের একদল মুসললান গ্রামবাসী ১৯২০ এর দশকে পুলিসের কাছে এজাহার দিতে গিয়ে বলেছে, এই গ্রামে মোটে পাঁচ ঘর বাঙালি, বাকি সব মুসলমান। বারবার এটাই দেখা যাচ্ছে, এটাই প্রথা ছিল। বাংলাভাষী হিন্দু নিজেকে বাঙালি বলত, এবং বাংলাভাষী মুসলমান নিজেকে বলত মুসলমান। শরৎচন্দ্র এজন্যই লিখেছেন বাঙালিদের সঙ্গে মুসলমানদের ফুটবল ম্যাচের কথা, এবং প্রচুর গালাগাল খেয়েছেন নজরুল ইসলাম (আইপিএস) এর মত লোকজনের কাছে, যারা শরতের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পেয়েছেন। অতচ, শরৎ স্রেফ একটা ব্যবহারিক সত্যের উল্লেখ করেছেন মাত্র।

তো এই বাংলাভাষী মুসলমান নিজেকে কবে থেকে বাঙালি বলতে শুরু করল? উত্তর, ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে। কেন বলল? কারণ সে যুগেও ওখানে ২৮% হিন্দু ভোট ছিল। তাদের বাদ দিলে, পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানের থেকে পূর্ব পাকিস্তানের কেবলমাত্র মুসলমানের সংখ্যা কিন্তু কম। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু মুসলমান মিলিয়ে দেখলে, পূর্বের ভোটার বেশি। সংক্ষেপে, এই হল আওয়ামি মুসলিম লিগ নামক দলটির আওয়ামি লিগ হয়ে ওঠার উদার ও অসাম্প্রদায়িক ইতিহাস।

মজার ব্যাপার হল, এইসময় থেকে এই ভাষাবাদী বাঙালিত্বের যে সংজ্ঞা বাজারে ছাড়া হল, বাংলাভাষায় কথা বললেই সে বাঙালি (যেটা পশ্চিমবঙ্গের বাম-সেকুলার মহলের উদ্যোগে আমাদের এই তথাকথিত শিক্ষিত অংশটিকে খুব করে গেলানো হল), সেটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবোচিত নয়। এক, আরবী ফার্সি উর্দু শব্দের মিশেলে ওই ভাষাটা খুবই অন্যরকম হয়ে গেছে, আদ্ধেক শব্দের মানে বুঝতে প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। হিন্দি আর উর্দুর ব্যাপারটা যেরকম। তাই বাংলায় কথা বলা মুসলমানদের বাংলাটাকে আংলা বলাই যুক্তিসঙ্গত। দ্বিতীয়ত, শুধু ভাষা দিয়ে পৃথিবীতে কোথাও জাতির সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় নি, সবসময়ে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে। পৃথিবীতে কোথাও শুধু ভাষা দিয়ে জাতীয়তা নির্ধারিত হয় না, হয় নি। সিভিক জাতীয়তাবাদ বা পাসপোর্ট জাতীয়তাবাদের কথা আলাদা, সেটা ঠিক জাতীয়তাবাদ নয়, সেটাকে জাতীয়তাবাদের অ্যাপলজি (জাতীয়তাবাদের একটা করুণ সংস্করণ) বলা যায়। এই মত অনুযায়ী ভারতের পাসপোর্ট যার কাছে আছে, সে-ই ভারতীয়। কথাটা ভুল নয়, কিন্তু এটা জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হতে পারে না। জাতীয়তাবাদ বলতে বেশিরভাগ মানুষ, জাতীয়তাবাদের বন্ধুরা এবং শত্রুরা যা বোঝে, সেটা সংস্কৃতি ছাড়া সংজ্ঞায়িত হতেই পারে না। পৃথিবীর যে কোনও উন্নত দেশের জাতীয়তাবাদ অবশ্যই সংস্কৃতিনির্ভর।

এখানে অবশ্য একটা ব্যাপার দ্রষ্টব্য। ভাষাটাকে সংস্কৃতি থেকে আলাদা করার এই বাম-সেকুলার-বঙ্গীয় প্রয়াস অবশ্যই সর্বত্র দেখা যায়নি, কাজেই বাংলার বুকে আজ ভাষাবাদের বিরুদ্ধে (আমি একে ব্যঙ্গ করে ভ্যাষনালিজম বলে থাকি, অর্থাৎ ভাষাবাদ ও ন্যাশনালিজমের বকচ্ছপ মূর্তি) আমাদের যেমন বলতে হচ্ছে, সেই পরিস্থিতি বেশিরভাগ দেশেই অবস্থান করে না। ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে এরকম দ্বিত্ব আসার তো কথা নয়, একে তো অপরের পরিপূরক। কিন্তু যেখানে এসে যায়, ধরা যাক যেখানে ভাষা আর সংস্কৃতির মধ্যে ওই আম্বিলিক্যাল কর্ড বা নাড়ির টান ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, সেখানেই দেখা যাচ্ছে, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সংস্কৃতিই গড়ে দিচ্ছে জাতীয়তা ও একাত্মবোধ, ভাষা নয়।

যেমন, সার্বিয়ান আর ক্রোয়েশিয়ানদের মধ্যে নব্বইয়ের দশকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের কথা অনেকেই জানেন। এরা কিন্তু একই ভাষায় কথা বলেন। সার্বিয়ানরা অর্থোডক্স চার্চের অনুগামী, কিরিলিক বর্ণমালা ব্যবহার করেন। ক্রোয়েশিয়ানরা ক্যাথলিক চার্চের অনুগামী, রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করেন। এরা দুটো আলাদা জাতি হয়ে গেছেন।

একবার একটা ছড়া লিখেছিলাম, যার শুরুটা ছিল এরকম—ইরান থেকে নাম নিয়েছি/তুর্কি পাঠান গেরস্থালী/ আরব থেকে ধর্ম, নেহাত/বাংলা বলি তাই বাঙালি। আসলে বাংলা বললেই বাঙালি হয় না, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি, বাঙালির দেশজ ধর্ম সেই বাংলাভাষীর জীবনচর্যায় প্রতিফলিত হয়।

এখানে একটা মজার ব্যাপার দেখুন। বাংলায় ফাজিল মানে কি আমরা সবাই জানি, এর মানে হল ফিচেল। অথচ মুসলমানদের মধ্যে, আরবী-ফার্সি ভাষায় ফাজিল মানে শিক্ষিত, মাদ্রাসায় পড়ে দস্তুরমত ফাজিল হতে হয়। বুজরুক মানে আমাদের মধ্যে হল ঠকবাজ, কিন্তু আসলে তো মুসলমানদের ভাষায় শব্দটার মানে জ্ঞানী বৃদ্ধ। এগুলো কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছে, বাংলাভাষাটা আসলে কোন অত্যাচারের সাক্ষী, বাঙালি এই বহিরাগত আগ্রাসনকারীদের কি চোখে দেখেছে, এবং আমাদের ভাষা ও আমাদের সংস্কৃতি কিভাবে বাচিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে বিজাতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে।

৩
অশনি সংকেত

বাঙালির ভ্যাষনালিস্ট সংজ্ঞায় সবথেকে বেশি উল্লসিত যারা (কারণ এভাবে বিভ্রান্ত বাঙালির ঘাড় সহজে মটকানো যাবে), সেই পূর্ববঙ্গের/পূর্ব পাকিস্তানের/বাংলাদেশের মুসলমান নেতাদের মধ্যে সিন্দবাদের গল্পের সেই বুড়োটাকে প্রায়ই দেখতে পাই। এরা প্রথমে পশ্চিম ভারতের/পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের কাঁধে চাপলেন, মনের সুখে হিন্দু মারলেন (মুসলিম লিগ তৈরি হওয়ার পর থেকে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র বারবার যেভাবে গণহত্যা, গণধর্ষণ, মন্দির ভাঙা হয়েছে, তার বিস্তারিত ইতিহাস আজও লেখা হয়নি)। এবং পশ্চিমী মুসলমানের কাঁধে চেপে পেলেন পাকিস্তান। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের কাঁধে চাপলেন, অজস্র হিন্দুর রক্তের বিনিময়ে হল বাংলাদেশ (মার্কিন সাংবাদিক গ্যারি বাস রচিত 'ব্লাড টেলিগ্রাম' বইটি দ্রষ্টব্য। মুক্তিযুদ্ধে যত মানুষ মারা গেছিলেন, তার নব্বই শতাংশের বেশি হিন্দু ছিলেন, আমেরিকার গোপন নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে)। এর ওপরে আজকাল এখন তেল উৎপাদনকারী মুসলমান দেশগুলোর ঘাড়ে চেপেছেন, আমেরিকার ঘাড়েও চাপার সফল প্রয়াসে ভাস্বর এদের রাজনৈতিক প্যাঁচঘোঁচ। বাংলাদেশি মুসলমানেরা টি শার্ট পরিধান করেন, এবং দাড়ি রাখেন না, ফলে বুদ্ধিমান আমেরিকান সাহেবরা মনে করেন যে ওরা হলেন উদারপন্থী মুসলমান। মাঝখান থেকে হিন্দুগুলোর প্রাণান্তকর অবস্থা, রোজই মরে, রোজই জমি বেদখল হয়ে যায়, রোজই মন্দির ভাঙা দেখতে হয় অসহায়ের মত, ফি ঈদেই মন্দিরের সামনে গরু কাটা দেখতে হয়। আর এপারের সেকুলাররা এমনই হয়ে গেছে, ঘরের পাশে বাংলাদেশে হিন্দুনিধন নিয়ে একটা কথা না বললেও, নয়ডার দাদরিতে কি হয়েছে, তা নিয়ে প্রতিবাদ করতে বড়ই পটু। দাদরি তো তাও বেশি দূর নয়, প্যালেস্টাইন নিয়ে এদের দরদ যেভাবে উথলে পড়ে, এবং বাংলাদেশের হিন্দু এথনিক ক্লিনজিং নিয়ে এরা যেভাবে নীরব (এখন সম্ভবতঃ ৬%, বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা সাতচল্লিশ সালে ছিল ৩৫% শতাংশ), তা থেকে বোঝা যায়, কুমীরদের চোখে পর্দা বলে কিছু সত্যিই থাকে না।

কিন্তু বাংলাদেশ তো তাও খানিকটা দূরে। পশ্চিমবঙ্গের কি অবস্থা? জানেন কজন? পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা ২০৫০ সাল নাগাদ সংখ্যালঘু হয়ে যেতে পারে, এই মর্মে একটা স্টাডি হয়েছিল, সেটা যখন শেয়ার করেছিলাম ফেসবুকে (২০১১ বা ২০১২ সাল হবে), তথাকথিত সেকুলারদের মধ্যে কি বিপজ্জনক পরিমাণে সরাসরি ইসলামিস্ট এজেন্ট লুকিয়ে বসে আছে, টের পাওয়া গেছিল।

আমি নিজেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বলি। আমি এবং আমার কয়েকজন সহযোদ্ধা একটা বাঙালি জাতীয়তাবাদী

ডিসকোর্স বা চিন্তন আন্দোলন তৈরি করার চেষ্টা করছি। আজকের বাঙালি এই বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারে না, চিন্তাশালী ব্যক্তি মাত্রেই একমত হবেন। কিন্তু এই বিষয়গুলিও বাঙালি আত্মপরিচয়ের সংগ্রামকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। অর্থাৎ যারা আজ ইসলামের আগ্রাসন নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাঁরা অবশ্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করবেন না। আমি অনেকবার বলেছি, এই সমস্যার সমাধান সঙ্ঘ পরিবারের কাছে নেই। ওরা পারলে কাশ্মীরের পণ্ডিতদের মত, বাঙালিকেও পেশাদার ভিখিরি করে বিশ্বের দরবারে বসিয়ে দেবে।

বলতেই হচ্ছে, বাঙালি জাগো। খুব ক্লিশে শোনায়, তাই না? কিন্তু তাও বলতে হচ্ছে। বাঙালি, জাগো। এখনও না জাগলে, এটাই তোমার চিরঘুম হতে চলেছে।

৪

বাংলাদেশ কি বাঙালির দেশ?

ভারতে আমরা কেউ কেউ যারা অবাঙালিদের মধ্যে, তাদের ভূমিতে, বাংলার বাইরে বাস করি, বা যারা ভারতের বাইরে থাকেন, কেউই দুর্গাপুজোর ছুটি পান না। স্বাভাবিক। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৌলতে অবশ্য রেস্ট্রিক্টেড হলিডে বলে একটা জিনিস পাই, তার দ্বারা সপ্তমী অষ্টমী নবমীর মধ্যে যে কোনও দুদিন ছুটি নেওয়া যায়। সে যাই হোক।

বাংলাদেশে দুর্গাপুজোর ছুটি প্রথমে দেওয়া হয়নি একছর। দশমী বৃহস্পতিবার, আর ইসলামিক মতে ওদের সাপ্তাহিক ছুটি হল শুক্রবার (আমাদের রবিবারের মত), এবং ওই শুক্রবারটাকেই উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ করে ওদিনই দুর্গাপুজোর একদিন ছুটি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য দেশজোড়া হিন্দুদের প্রতিবাদে অবস্থাটা পাল্টেছে এবং দুর্গাপুজোর সবেধন নীলমণি একদিনের ছুটিটি দশমীর দিনে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার মিলেছে। বেশ ইন্টারেস্টিং। দুর্গাপুজোয় একদিন ছুটি, তাও কষ্টেসৃষ্টে মেলে। বাংলাদেশ যে বাংলার বাইরে, বাংলাদেশ যে বাঙালির ভূমি নয়, এর থেকে বড় প্রমাণ আর কি দরকার আছে?

বর্তমানে যে শারদীয়া দুর্গাপুজো আমরা দেখি, সেটা সিরাজের পরাজয়ের পরে শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ এবং নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র শুরু করেন। এরকম মাস স্কেলে পুজোর অনুষ্ঠান করা মধ্যযুগে শরীয়া আইন চালু থাকার ফলে সম্ভব ছিল না, যদিও দুর্গাপুজো এর আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, তবে এত বড় আকারে সর্বস্তরের বাঙালির অংশগ্রহণে ভাস্বর এই চেহারা সঙ্গত কারণেই মধ্যযুগে ছিল না।

এবং বাঙালির মধ্যে এই দুর্গাপুজোর শেকড় অনেক গভীর। আগেই বলেছি, সেই শেকড় ভারতের প্রাচীনতম দর্শন সাংখ্যের প্রকৃতির ধারণায় ছিল।

দুর্গাপুজো নিয়ে কিপটেমি করে বাংলাদেশ সরকার আমাদের তত্ত্বটাকেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন—শুধু ভাষা দিয়ে বাঙালি জাতি সংজ্ঞায়িত হয় না, সাংস্কৃতিক প্রশ্নটি সেখানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি আত্মপরিচয় সংস্কৃতিগত, স্রেফ ভাষাগত নয়। এবং যে দেশের সংবিধান শুরু হয়েছে বিসমিল্লাহ রহমানুর রহিম দিয়ে, যে দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সেটা সঙ্গত কারণেই বাঙালির দেশ হতে পারে না।

বাংলাদেশ বাঙালির দেশ নয়, সরকারীভাবেই দেখা যাচ্ছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের জমিজমা ঘরবাড়িকে ওরা বলতেন শত্রু সম্পত্তি, আজকাল অর্পিত সম্পত্তি বলেন। আমরা এবার ওদের শত্রু দেশ বলতে পারি বোধহয়, পরিবর্তে অর্পিত দেশও বলা যায়।

বাংলাদেশ থেকে শুধু বাঙালি উদ্বাস্তু হয়নি। হারিয়ে গিয়েছে ইতিহাস, একটা মনন ও চেতনাকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী থেকে চন্দ্রদ্বীপ, ঢাকা চট্টগ্রাম থেকে প্রতাপাদিত্যের যশোর, রাণী ভবানীর নাটোর থেকে পুরাণের চাঁদ সদাগরের স্মৃতিধন্য পাবনা/পৌণ্ড্রবর্ধন/বারেন্দ্রভূম, সমস্তই ছিন্নমূল হয়েছে। সে ট্র্যাজেডি এই প্রবন্ধের বিষয় নয়, বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। কিন্তু বাঙালি তার হারিয়ে যাওয়া শেকড়ে ফিরুক, সেটা আশু প্রয়োজন।

৫

বাঙালি জাতিসত্তা বলব না

বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের কাজ করতে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা হল, যে মুহূর্তে একজন এই বাক্যবন্ধ উচ্চারণ করে, "বাঙালি জাতিসত্তা", তখনই সেই ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে।

জাতিসত্তা কথাটার আক্ষরিক ইংরেজি করলে হয় নেশন বিইং। এরকম কোনও ইংরেজি কথাই হয় না। আমি নিজে জাতীয়তাবাদ বিষয়ে গবেষণা করেছি, আমার পিএইচডি-র গবেষণা সন্দর্ভ লিখতে গিয়ে আইরিশ জাতীয়তাবাদ নিয়ে প্রচুর পড়তে হয়েছে, জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত কোনও প্রবন্ধে কোথাও এমন কোনও ইংরেজি কথা আমার চোখে পড়েনি।

এখানে বলে রাখি, আয়ারল্যান্ডের বহু শতাব্দী যাবত নিজস্ব দেশজ ধর্ম হল ক্যাথলিক। খ্রীষ্টধর্ম আসার আগেও কেল্টিকদের একটা নিজস্ব পেগান ধর্ম ছিল, এদের পুরোহিতদের বলা হত

ড্রুইড। সেই নিজস্ব পেগান ধর্মের অনেকটা আত্তীকরণ করেই আয়ারল্যান্ডের এই ক্যাথলিক ধর্মের বহুশতাব্দীপ্রাচীন চেহারা। ইংরেজরা যখন আয়ারল্যান্ড দখল করে গায়ের জোরে এবং তার কিছু সময় পরে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম চাপিয়ে দেয় (সেটাও খ্রীষ্টধর্ম, অনেকটা ইসলামের শিয়া সুন্নির মত ভেদাভেদ আর কি), তখন থেকে আয়ারল্যান্ডে এরকম আমাদের বাংলায় যে বিভাজন দেখি, সেরকমই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু চিত্তাকর্ষকভাবে, যারা আয়ারল্যান্ডের নিজস্ব ক্যাথলিক ধর্ম পালন করে, তাদেরকেই আইরিশ বলা হত, এবং ইংরেজদের বংশধর, বা ধর্মান্তরিত প্রটেস্ট্যান্ট, এদেরকে বলা হত অ্যাংলো আইরিশ। এই শব্দবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। যারা দেশজ সংস্কৃতির অনুগামী, তাদেরই অধিকার আছে জাতীয় পরিচয়ে। অন্যরা, পরাধীন হয়ে গিয়ে, পরিচয়ের সেই স্বকীয়তা হারিয়েছে, এবং পরমুখাপেক্ষী, পরানুকরণে ব্যস্ত থেকে তাদের জাতীয়তাবোধটাই নষ্ট হয়েছে। আজ ক্যাথলিক আয়ারল্যান্ড স্বাধীন দেশ হলেও, আয়ারল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্ট অংশটি আজও ইংরেজের অনুগামী, ইউনাইটেড কিংডমের অন্তর্গত।

যাই হোক, প্রসঙ্গ হল, ন্যাশনালিটি কথাটার অনুবাদ হয় জাতীয়তা। জাতিসত্তা কোনমতেই নয়।

জাতিসত্তা সম্পর্কে আমার ধারণা হল এই। এই জাতিসত্তার উৎস হল মার্ক্সের স্পিশিজ বিইং (species being) থেকে ধার নিয়ে তৈরি করা একটা কোনও রুশ শব্দ। যার ইংরেজি করলে দাঁড়ায় নেশন বিইং, বাংলায় জাতিসত্তা। বলা দরকার, এই স্পিশিজ বিইং কথাটা গোলমেলে। এটা মার্ক্সের যুবা বয়েসের থিওরি, পরিণত বয়েসে মার্ক্সও কিন্তু এই কথাটা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করেননি। যে কারণে আমরা বিশ্বমানবতা তত্ত্বটার বিরোধী, সেই একই কারণে এই স্পিশিজ বিইং এর বিরোধিতা আমরা করব। স্পিশিজ বিইং তত্ত্বটি আসলে লিবেরাল হিউম্যানিজম উদ্ভূত, মানুষ তার স্থানকালপাত্রের সীমাকে অতিক্রম করে এক অসীমে উত্তীর্ণ হয় এই তত্ত্বের মতে। এটা বিভ্রম। মানুষ একটি স্থান, কাল ও সংস্কৃতির ফসল, এবং সেটাই জাতীয়তাবাদের মূল কথা। স্পিশিজ বিইং থেকে তৈরি এই নেশন বিইং আসলে ভাবের ঘরে চুরি। জাতিসত্তা নামক এই কাঁঠালের আমসত্ত্ব আসলে বিশ্বামানবতাভিত্তিক জাতীয়তা। এর আসল মানে হল আপনি বলির পাঁঠা। আপনি সোভিয়েত ইউনিয়নে অ-রুশ, আপনি কমিউনিস্ট শাসনাধীন বাঙালি।

এবং এই জাতিসত্তা কথাটা রুশপন্থী কমিউনিস্টরাই বাংলায় প্রথম আমদানি করেছেন (চীনপন্থীরা সম্ভবত করেননি। এরা প্রকাশ্য দিবালোকেই তিব্বতীদের সমস্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের কাঁথায় আগুন দিয়েছেন, পাকিস্তানকে সমর্থন করেছেন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, এতকিছু করে আবার জাতিসত্তা নিয়ে গলাবাজি করে থাকলে অবশ্য চোরের মায়ের বড় গলা কথাটাই পুনরায় প্রমাণিত হবে)। প্রকৃতপক্ষে জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচুর ঢক্কানিনাদ হয়েছিল (আসলে ভেতর ছিল স্রেফ ঢুঁ ঢুঁ)। একদল বাঙালি আজও সেই বস্তাপচা কথা "জাতিসত্তা" তোতাপাখিসম আউড়ে যাচ্ছেন।

এই জাতিসত্তা বলার পরেই এরা দেখবেন বলবে, গোর্খা জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাই (অতএব উত্তরবঙ্গকে দিয়ে দাও মায়ের ভোগে, থুড়ি, গুরুংদের ভোগে)। তারপরে আবার অনেকে এরও এককাঠি বাড়া, এরা ভারতবিরোধী, এরা বলবে বাঙালি জাতিসত্তা চাই, তাই দিল্লির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সঙ্গে এক হও।

জাতিসত্তার কথা যারা বলেন, তারা আর যাই হোক, বাঙালি জাতীয়তবাদী নন। তারা বাঙালির ভাঙা হাটে দালালি করতে নেমেছেন, বাঙালিকে কতগুলো অর্থহীন জার্গন গেলাতে এসেছেন, বাঙালিকে ভেতর থেকে দুর্বল করতে এসেছেন। এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

৬

শেষের কথা

সংস্কৃতি হল সমষ্টি ও সম্প্রদায়ের স্তরে ভাগ করে নেওয়া অভিজ্ঞতা, যা বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা (মিডিয়ামে) সঞ্চালিত হয়। আমরা যখন সংস্কৃতির ওপরে জোর দিচ্ছি, একই সঙ্গে সমস্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার (পশ্চিম থেকে আসা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা ইনডিভিডুয়ালিজম, যা লিবেরিজম থেকে উদ্ভূত) অপসারণ চাইছি, কারণ এই আদর্শটি আমাদের জাতীয়তাবাদীদের প্রধান শত্রু। আসল সংস্কৃতির পরিধি কিন্তু আমাদের সেকুলারমনা বাঙালি ভদ্রলোকের তৈরি করা হুজুগে "কালচার" (তার নিজেরই বানানো এক আশ্চর্জস্তু যা থিয়েটার, বসে আঁকো, নৃত্যনাট্য, গান এবং রবীন্দ্রজয়ন্তী ইত্যাদির একটি কিম্ভূত মিশ্রণ)-এর তুলনায় অনেক, অনেক বড়।

হিন্দু ধর্ম ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রিয় সংস্কৃতি বা পপুলার কালচার, বস্তুত যাকে আমার হিন্দুধর্ম বলে জানি, তা হল ভারতের সমস্ত দেশজ সংস্কৃতির এক মহাসমাহার। এখানে বলা দরকার, ধর্ম আর রিলিজিয়ন এক জিনিস নয়; ধর্ম অর্থে জীবনচর্যা, যা রিলিজিয়নের তুলনায় অনেক বেশি

ব্যাপ্ত। কথা হল, বাঙালিকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে এই হিন্দু ডাইমেনশনটি অত্যন্ত অপরিহার্য। যে বিশ্বাস করে বাংলার নিজস্ব দর্শনে, যার নাম দেশজ ভাষায় (বিদেশী বিজাতীয় ভাষায় নয়), যার দেশজ খাদ্যাভ্যাস, দেশজ বেশভূষা-পরিধান অবলম্বন করে যার জীবনযাপন, এবং যার শেষপর্যন্ত বাংলার নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য আছে, যার শেষবিচারে মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্য আছে (কোনও বিদেশের প্রতি নয়), তাকেই ইতিহাস বাঙালি নামে ডেকেছে। এই ইতিহাস যেন ভুলে না যাই।

এ প্রশ্ন উঠবেই যে বাঙালি এত সহজে এই ইতিহাস স্বেচ্ছায় ভুলে যাচ্ছে কেন? সমস্যাটা হল কোথায়? আমার ব্যাখ্যা হল এই ঃ কমপ্রাদরগিরি বা বহিরাগত শক্তির দাসত্ব-দালালি করা বহুকাল যাবৎ বাঙালি এলিট শ্রেণির এক সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। পিছিয়ে দেখতে গেলে সেন আমলে এর শুরু এবং যেহেতু পাল সাম্রাজ্যের পতনের পরে বাংলার আর কোনও নিজস্ব/বাঙালি ক্ষমতা কেন্দ্র ছিল না, তাই সবসময়ই উচ্চশ্রেণির বাঙালির একাংশ এমন কোনও শক্তিশালী ভিন্নতায় মজেছে, মুগ্ধ থেকেছে, যার সামনে আত্মসমর্পণ করা যায়, চাকরির আশায় নিজেকে নিবেদন করা যায়, এবং সেই শক্তির দাসত্ব স্বীকার করা যায়। আমাদের সময়ে চলতি ভাষায় এরই ভালোনাম উদারপন্থা বা বিশ্বমানবতা।

সেন আমল থেকেই বাংলার উচ্চবর্ণের মধ্যে কমপ্রাদর বা দালালশ্রেণীর আধিপত্য। এদেরই একদল লক্ষ্মণসেনকে বুঝিয়েছিল যে বখতিয়ার খিলজি বাংলার ভবিষ্যত শাসক হতে চলেছে এরকমটা শাস্ত্রের ভবিষ্যৎবাণী, তাকে বাধা দিয়ে লাভ নেই (এই আচরণ ইতিহাসে রেকর্ডেড আছে)। এরা নিজেরা কি লাভের আশায় সেটা করেছিল, সহজেই অনুমেয়।

আসলে দেশজ ব্রাহ্মণদের (বেশিরভাগই বৌদ্ধ) হটিয়ে (তাদের বংশধররা পরে চণ্ডাল বা নমঃশূদ্র নামে পরিচিত হয়) কনৌজ থেকে একদল বামুনকে এনে বসানোটাই ক্ষতিকর হয়েছিল। যে ওপর থেকে ক্ষমতা পায়, সে ক্ষমতার বদলের সম্ভাবনা দেখলে দ্রুত আনুগত্য পাল্টে নতুন দাসত্বে ঢুকে যাবে, লড়াই তো আর করবে না। দেশের জন্য সে-ই লড়বে, যার শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। এজন্য ইন্ডিজেনাস পাওয়ার ব্লক যেখাইে ছিল ভারতে, সেখানেই বিদেশী বিজাতীয় শাসক বাধা পেয়েছে (যেমন মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজপুতানা)। বাংলায় সেগুলো সেন এক্সপেরিমেন্টের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছিল, ফলে প্রতিরোধ হয় নি, আজও সহজে হতে পারছে না।

তাই এরা মধ্যযুগে পিরালী বামুন, ইংরেজ আমলে সাহেবদের দাসানুদাস, এরপরে কখনও চীনের চেয়ারম্যান এদের চেয়ারম্যান, আর আজ এরাই সেকুলার সেজে ইসলামের দালাল। বাঙালি এলিটদের একাংশ অভিশপ্ত, এবং এজন্যই বাঙালি জাতিকে ভেতর থেকে ধ্বংস করার কাজটা অনেকদূর পর্যন্ত নির্বিঘ্নে করা গেছে।

আজ আমাদের তাবৎ ঘেঁটে-ঘ, অবোধ বাম-সেকুলার-উদারবাদীদেরকে বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়ে চলেছে ইসলামিস্টরা। এই সব বাঙালি বিশ্বমানব-উদারবাদীদের চিরাচরিত অভ্যেস হল বাংলাদেশের অত্যাচারিত হিন্দুদের ব্যাপারে চোখে ঠুলি এঁটে, পিঠে কুলো বেঁধে এবং কানে তুলো গুঁজে তুমুল আঁতলামি করা। চাকরি-সর্বস্ব ভদ্রলোক হওয়ার কিছু সুবিধে আছে। যেহেতু ইনি কোল্যাবরেটর বা আঁতাতজীবী, অতি সহজেই নিজের বিশ্বামানবতাকে উচ্চে তুলে পুচ্ছ নাচাতে পারবেন, আর নিজে যেহেতু উচ্চবর্ণ, তাই ওদিকের নিম্নবর্ণের হিন্দুর রক্তের (ওরাই তো মূল শিকার ইসলামের আগ্রাসনের) বিনিময় সস্তায় সহজ ও পুষ্টিকর সেকুলারিজম কিনতে পারবেন।

অনুপ্রবেশ করে, বিদেশী অর্থপুষ্ট বৌদ্ধিক প্রচারের মাধ্যমে এবং বাম-তৃণের ছত্রছায়ায় পশ্চিমবঙ্গে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে, এবং বাঙালি পরিচয়ের শেকড়ে না ফিরলে আমারা কিন্তু অচিরেই গ্রেটার বাংলাদেশের গর্ভে ঢুকে যাব। তবে না বলে পারছি না যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল এই, তারা পশ্চিমবঙ্গের সিভিল সোসাইটির মধ্যে সংস্কৃতিগতভাবে শুদ্ধ, নীতিগতভাবে বেপথু এবং রাজনীতিগতভাবে আত্মহননকারী এক বাঙালি পরিচয়ের প্রতি ভালোবাসার জন্ম দিয়েছে।

এই বিশেষ বাঙালিত্বের সংজ্ঞা দাবী করে, আগেই বলেছি, যে বাংলা ভাষায় কথা বলাটাই হল বাঙালি পরিচয়ের একমাত্র নির্ধারক। ভাষাবাদের সঙ্গে ন্যাশনালিজমের এই খচ্চরায়িত মিশ্রণকে ভ্যাষনালিজম বলেছি বটে, তবে একে ভাষা-nullism নামেও ডাকা যায়, কারণ বাংলাভাষাকে দেশজ লোকায়ত সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে উপড়ে ফেলে এই মতবাদ। বাংলাভাষাকে তার মাতৃদুগ্ধসম উৎস থেকেই বঞ্চিত করে। এই ভ্যাষানালিজম যারা করছেন, তাদের বাংলাবাজ বলা যায়, তারা বাংলাভাষাকে বাঁচানোর নামে আসলে তাকে null and void বানিয়ে দেওয়ার পথে হাঁটছেন।

এই ভ্যাষনালিজম আমাদের বাঙালি পরিচয়ের উৎস খোঁজার প্রয়াসকে সফলভাবেই ঘেঁটে দিয়েছে। বাঙালির এই 'সেকুলার', বিশ্বমানবিক, অবসারিত (attenuated) ভাষাবাদী

সংজ্ঞা আসলে বৃহত্তর বাংলাদেশ তৈরির একটা ষড়যন্ত্র। এই ভাষাবাদকে আমি বাংলাবাজি বলতে চাই, এবং এই ভ্যাষনালিস্টরা পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের একটা সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ফ্রন্ট খুলেছেন।

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণটি আরেকবার বলি। সাতচল্লিশ সালের দেশভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মুসলমান আবিষ্কার করে যে উর্দুভাষী মুসলমানেরা সমগ্র পাকিস্তানে তাদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি এবং সমস্ত ক্ষমতা তাদেরই হাতে। উর্দুভাষীদের দাপটের মোকাবিলা করার একমাত্র উপায় ছিল বাংলাভাষী হিন্দুদের সঙ্গে নেওয়া। একসঙ্গে এক ছাতার তলায় এলে বাংলাভাষী হিন্দু ও বাংলাভাষী মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ও তাদের দাপটকে ছাপিয়ে যেতে সক্ষম ছিল।

কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুকেই তার রক্তমাংস হাড় দিতে হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য। মুক্তিযুদ্ধ যাকে বলা হয়, তা তো আসলে হিন্দু নিধন, হিন্দু ধর্ষণের একটানা ম্যারাথন।

ইতিহাসের একটা আশ্চর্য মোড়ে বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ বাঙালিত্ব দাবি করতে শুরু করে (এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময়েও বাংলাদেশে ২৩% হিন্দু ছিল, এই ভোটব্যাঙ্কের ঘাড়ে চাপা দরকারী ছিল কাজেই), বাঙালি জাতীয়তাবাদের একচেটিয়া ধারক-বাহক হিসেবে নিজেকে তুলেও ধরে। অবশ্যই সেটা বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল না, সেটা ছিল বাংলাভাষী মুসলমানের ক্ষমতাদখলের প্রয়াস, এবং তাই এই বিশেষ আওয়ামি আন্দোলন মরিয়া হয়ে দেশজ সংস্কৃতিকেই (যে কোনও জাতীয়তাবাদেরই যা প্রধান নির্ধারক) জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় পরিচয়ের সংজ্ঞা থেকে পৃথক করতে চেয়েছিল, আর প্রায় হিস্টেরিয়া রোগীর মত ভাষা, ভাষা বলে হন্যে হয়ে উঠেছিল (ইসলামিস্টদের এজেন্ট কবীর সুমন তো গানই লিখে ফেলেছেন, ''যে ভাষার জন্যে এমন হন্যে, এমন আকুল হলাম...")। সেক্ষেত্রেও, এই ভাষার নামে যে ঐক্য ফলানো হল, আমরা দেখেছি যে সেটা অসার ও অবাস্তব, কারণ ওদের বাংলা ভাষায় হোলসেল আরবী-ফার্সি-উর্দু শব্দ ঢোকানোর ফলে সেটা পৃথক একটা ভাষা হয়ে পড়েছে, যেরকমভাবে আজ উর্দু ও হিন্দি দুটো আলাদা ভাষা।

একটি গোপন এজেন্ডা ছিল যা আমরা খেয়ালই করিনি। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানের স্বার্থের সংঘাতটাই ছিল আসল, বাঙালি পরিচয় শুধু দাবার বোড়ের মত ব্যবহৃত হয়েছিল এখানে। ওই মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুরাই পদাতিক হয়ে লড়েছে, তারাই কামানের খাদ্য হয়েছে, গণহত্যার শিকার হয়েছে, গণধর্ষণের জ্বালা সয়েছে, পুনরায় বলি, মার্কিন সাংবাদিক গ্যারি বাসের ব্লাড টেলিগ্রাম বইটি অত্যন্ত প্রামাণ্য এই বিষয়ে; আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন।

কোনও বিভ্রান্তিতে ভুগবেন না। ভাষাবাদের এপিসেন্টার বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা ওয়াহাবি/ফারাজি/সালাফি উগ্রতার পূর্ণ উত্তরাধিকার বহন করে, ওপর ওপর স্রেফ একটা বাংলা ভাষা উদ্‌যাপনের পলেস্তারা লাগানো হয় মাত্র। বাংলার হিন্দুকে তাদের পূর্বপুরুষের সহস্র সহস্র বছরের পবিত্র জীবনচর্যার ভাষার নামে ভুলিয়ে আসলে তারই সর্বনাশের ফন্দি আঁটছে এই ভ্যাষনালিজমের হেডকোয়ার্টার বাংলাদেশের ইসলামিস্টরা। এই পরিকল্পনাটি অত্যন্ত ধূর্ত—বাংলা ভাষার নামে বাঙালিত্বকে উচ্ছেদ করা, যাতে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ, সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এক বাঙালি পরিচয় গড়ে ওঠার সমস্ত সম্ভাবনা সমূলে বিনাশ হয়।

বাংলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু আজ ভ্যাষনালিস্টরা বাংলাভাষার নামেই বাঙালির শেকড়ের বিরুদ্ধে নাশকতা করছে। আজ একটা কড়া আদর্শগত লড়াইয়ের বড় প্রয়োজন। আমরা বাঙালিরা ভারতবর্ষের সীমান্তপ্রহরী। আরব থেকে আমদানি করা এই সাম্রাজ্যবাদ ও তার সেকুলার-উদারপন্থী-বিশ্বমানব দালালদের অনুগ্রহের কাছে পূর্ব ভারতকে সমর্পণ করব কি না, আমাদেরই ঠিক করতে হবে।

যে কোনও জাতীয় সংস্কৃতির প্রশ্নে, সেই জাতির বৈশিষ্ট্য, অন্য জাতির সঙ্গে তার পার্থক্যের প্রশ্ন সবসময়ে গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে। আমি বাঙালি হিসেবে অন্য অবাঙালির থেকে, বা মুসলমানের থেকে আলাদা, এ কথা বললে পৃথিবীর অন্যত্র কেউ সে উচ্চারণকে সাম্প্রদায়িকতা বলত না। এই পার্থক্য বা ডিফারেন্স অত্যন্ত যৌক্তিক একটা সীমারেখা, এবং তা একটা জাতির পরিচিতিকে নির্দিষ্ট চেহারা দেয়। কিন্তু বাংলার বুকে আজ এই পার্থক্যকে বিশ্বামানবতার নামে অস্বীকার করার প্রয়াস চলছে যাতে আমরা নিরস্ত্র হয়ে পড়ি আর আমাদের গলায় ইসলাম বেশ করে ঠুসে দেওয়া যায়।

বাংলা ভাষাকে একটা ফেটিশ (fetish) হিসেবে উদ্‌যাপন করা, একটা বায়বীয় গ্যাসবেলুন হিসেবে উদ্‌যাপন করা অর্থহীন যতক্ষণ না দেশজ সংস্কৃতির ওপরে নির্ভর করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সংগঠিত হয়। প্রত্যেক ভ্যাষনালিস্ট শুরু করেছে উল্টো দিক থেকে, উল্টো ক্রমপর্যায়ে। জাতি থেকে,

জাতীয়তাবাদ থেকে, সাংস্কৃতিক পরিচয় থেকে শুরু করলে তবেই ভাষার ক্ষমতায়নে পৌঁছানো যাবে। এরা শুরু করেন ভাষা দিয়ে, এবং তারপরে আর এগোতে পারেন না, স্রেফ এক অর্থহীন ও অসার বাংলাবাজিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যান। শুধুমাত্র যখন বাঙালিরা একটা জাতি, একটা সম্প্রদায় ও একটা অর্থনৈতিকভাবে সংগঠিত অস্তিত্ব হিসেবে সংগঠিত হবে, একমাত্র তখনই আমাদের মাতৃভাষা সম্মানের আসন পাবে। মারাঠিদের দেখুন, পাঞ্জাবিদের দেখুন, তামিলদের দেখুন, বুঝতে পারবেন।

অন্যথায়, তা যদি না করা যায়, আর স্রেফ এই অমর একুশের বাংলাবাজি চলতে থাকে (উনিশে মে নিয়ে কারও তাপোত্তাপ নেই), তা হবে ভস্মে ঘি ঢালা। অন্যথায়, বামপন্থীদের মুরুব্বি ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, এরা পা দিয়ে নয়, মাথা দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছেন। বাংলা ভাষাই এদের এই প্রয়াসে শেষপর্যন্ত বিপন্ন হবে, কারণ এরা বাঙালি পরিচয়ের সাংস্কৃতিক ও সম্প্রদায়গত সংজ্ঞা দিয়ে তাকে সংগঠিত করার চূড়ান্ত বিরোধী।

সমস্ত ভ্যাষনালিস্টদের জন্য সতর্কবাণী ঃ আমরা কিন্তু এখানে থাকছি, লড়াইয়ের ময়দানে থাকছি বাঙালি জাতীয়তাবাদের এক শক্তিশালী, ঐতিহাসিক এবং দেশজ সংজ্ঞাকে হাতিয়ার করে। লড়াই হবেই, ইসলাম এবং তাদের সেকুলার-লিবেরাল-বিশ্বমানবিক দালালরা কোনমতেই ফাঁকা মাঠ পাচ্ছেন না। এটাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পাল্টা যুদ্ধ ঘোষণা হিসেবে ধরতে পারেন।

শেষ করছি এই উদ্ধৃতিটি দিয়ে ঃ

"কোরান এবং তার থেকে উদ্ভূত ইসলামী আইন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভৌগলিকতা এবং জনচিত্রকে এক সাধারণ ও সহজ দুই জাতি এবং দুই দেশের বিভাজনে নামিয়ে আনে; বিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলিম আর অবিশ্বাসী অর্থাৎ কাফের। কাফের, অর্থাৎ অবিশ্বাসী হল "হার্বি", যাকে বলে শত্রু। ইসলাম অবিশ্বাসীদের জাতিকে নিষিদ্ধ করে, মুসলমান আর অবিশ্বাসীর মধ্যে এক চিরস্থায়ী শত্রুতা তৈরি করে।"

এটা কে বলেছে বলুন তো? কোনও সাম্প্রদায়িক চাড্ডি? আমার মত কোনও দুষ্টু সাম্প্রদায়িক লোক? বাঙালি আর মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাওয়া বঙ্কিম বা শরতের মত কোনও "সাম্প্রদায়িক" লেখক?

আজ্ঞে না।

এটা বলেছিলেন কার্ল মার্ক্স। ১৮৫৪ সালের প্রবন্ধ। শিরোনাম হল "ডিক্লারেশন অভ ওয়ার ঃ অন দ্য হিস্ট্রি অভ দ্য ইস্টার্ণ কোয়েশ্চন"। প্রবন্ধটি ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

(এই প্রবন্ধের কিছু অংশ এর আগে লেখক সপ্তডিঙায় ও ফেসবুকে প্রকাশ করেছেন।)

VOICE OF THE NATION IN KOLKATA

INDIAN VOICE

Books of Nationalist Writers

now available at this book store

70A, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata - 700006.
(Beside Hedua Park)

ব্যক্তিগত উদ্যমেরও প্রয়োজন আছে

দেবতনু ভট্টাচার্য্য

আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত স্তরে উদ্যম এবং উদ্যোগ নিয়ে কিছু করার বিষয়টাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বাংলার হিন্দুর এই লড়াইয়ের অনেকগুলি ফ্রন্ট আছে সেকথা নিশ্চই সবাই উপলব্ধি করছেন। এগুলোর মধ্যে হিন্দুর জমি বাঁচানো, হিন্দু মা-বোনদের রক্ষা করা, হিন্দুর ধর্মস্থান ও তার পবিত্রতা রক্ষা করা, হিন্দু সমাজের Moral down করার অপচেষ্টাকে প্রতিহত করা, হিন্দুর উপরে প্রত্যক্ষ আক্রমণের যোগ্য জবাব দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এইসমস্ত ফ্রন্টগুলোর মধ্যে আমি যেটাকে প্রাথমিকতা দেব, সেই সমস্যার গভীর অধ্যয়ন করা, এবং সর্বশক্তি নিয়ে তার সমাধানের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া - এই পথেই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। সার্বিক সমস্যা নিয়ে চেঁচামেচি করলে শেষপর্যন্ত বাস্তবে কিছুই করা হবে না। কারণ, আমাদের হাতে সময় কম। আমাদের পরিবার চালাতে হয়। আমাদের আর্থিক সামর্থ্য সীমিত। অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে প্রতিদিন ব্যক্তিগত দায়িত্বগুলো পালন করে যেতে হয়। তাই নিজের ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি কি করবো। কিন্তু অবশ্যই নিরেট এবং ফলপ্রসূ কাজ করতে হবে। প্রেসার কুকারের গ্যাস বার করে দেওয়ার মত নিস্ফল আস্ফালন করলে কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না।

এখন এই কাজে কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের ভুমিকা কি - এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মতে এই রকম উদ্যমী ব্যক্তিদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো এবং কাজ করার সময় তাদের সামনে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আসছে, সেগুলোকে দূর করার জন্য Back up support দেওয়াই একটা সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দুর সমস্যা সম্পর্কে হিন্দুদেরকে সতর্ক করার খুব বেশী একটা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। প্রথমতঃ যেটা দরকার, সেটা হল ইসলামি আগ্রাসন শুধুমাত্র ইরাক, সিরিয়া অথবা কাশ্মীরে চলছে তা নয়, এখন তা আপনার বাড়ির কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং এর পরবর্তী শিকার আপনি এবং আপনার পরিবার হতে চলেছে - হিন্দুদেরকে তা অনুধাবন করানো। তার জন্য বাংলার গ্রাম থেকে শহরে মুসলিম আগ্রাসনের যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে, সেগুলোকে যেকোন ভাবে সর্বসাধারণ হিন্দুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যারা নিজের নিজের জায়গায় সাহসের সাথে এই আগ্রাসনকে প্রতিহত করার জন্য বুক চিতিয়ে লড়াই করছেন অথবা লড়াই করার জন্য প্রস্তুত আছেন, তাদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করতে হবে। আর লড়াই করতে নামলে সেই লড়াইয়ে হিন্দু কোনদিন পরাজিত হয় না। তাই সর্বশেষ যেটা করতে হবে সেটা হল, বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুর বিজয়ের সংবাদ সকলের কাছে পৌঁছে দিয়ে হিন্দু যুবকদের অনুপ্রাণিত করা। আর একটা কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা হল এই সংগ্রামের পিছনে যেন সমাজের Moral support তৈরী হয় এবং সমাজ যাতে স্বতস্ফূর্তভাবে এই লড়াইয়ের রসদ জোগান দিতে প্রস্তুত হয় - তার ব্যবস্থা করা।

বাংলার গ্রামে গ্রামে মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুর এই প্রতিরোধ গড়ে তোলার লড়াইয়ে কার্যকরী ভুমিকা নিতে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। নিজে উদ্যোগ নিন। বন্ধুদের উদ্বুদ্ধ করুন। যদি কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকেন, সেই প্রতিষ্ঠানের উচ্চ নেতৃত্বকে এই লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে চাপ সৃষ্টি করুন। আজকেও যদি কেউ নীরবে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন, তিনি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করছেন একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে কি?

হিন্দু সংহতি তার জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার এই লড়াইকে প্রাথমিকতা দিয়ে এসেছে। আজকে এই লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তপন ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু সংহতি অগ্রণী ভুমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আর যারা এই সংগ্রামের পথকে প্রাথমিকতা দিয়ে নিরেট কিছু করতে চান, হিন্দু সংহতি তাদেরকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে প্রস্তুত।

হিন্দু সংহতি-র পক্ষ থেকে সকলকে জানাই

শুভ বিজয়াদশমী ও দীপাবলির

জাতীয়তাবাদী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সংস্কৃত সমস্ত ভারতীয় ভাষার জননী

অমিত মালি

প্রাচীন ভারতের মানুষেরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলত। তারা সংস্কৃত ভাষাকে মাধ্যম করে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছিলেন। 'সংস্কৃত' কথার অর্থ 'পরিশুদ্ধ'। গৌতম বুদ্ধ প্রথম সংস্কৃত ভাষার বিরোধিতা করেন। এবং পালি ভাষায় নিজের ধর্মমত প্রচার করেন। এছাড়া সমস্ত বৌদ্ধমঠগুলিতে সংস্কৃত ভাষার চর্চা ভীষণভাবে কমে আসতে থাকে। ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী বর্তমান ভারতে মাত্র ১৪,১৩৫ জন সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন।

সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় মত, সমস্ত ধর্মগ্রন্থ, আয়ুর্বেদ, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, জ্ঞানবিজ্ঞান—প্রভৃতি সবই লিখিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। ভারতের সমস্ত ভাষার সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃত থেকে—সেটা সংস্কৃত অক্ষর ও শব্দের সঙ্গে ভারতে প্রচলিত অন্যান্য ভাষাগুলির তুলনা করলে বোঝা যায়। শুধু ভারতীয় ভাষাগুলিকে নয়, ইউরোপীয়ান ভাষাগুলিও সমৃদ্ধ হয়েছে সংস্কৃত ভাষার দ্বারা। ইংরাজী বহু শব্দ যেমন Mother (মাতৃ), Brother (ভাতৃ), Father (পিতৃ), Path (পথ), Two (দ্বি), Axis (অক্ষ), Geometry (জ্যামিতি), Three (ত্রি), No (না), Dental (দন্ত), New (নব), Heart (হৃৎ), Percent (প্রতি শত); প্রভৃতি আরও অনেক শব্দ।

বাংলা ভাষার শতকরা ৫৫ শতাংশ শব্দই সংস্কৃত শব্দ। প্রচলিত কীর্তন ও ভজনে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। কর্ণাটকী ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। জার্মানীর ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয়।

এরকম একটি গৌরবময় ভাষার প্রতি হিন্দুদের এত উদাসীনতা কেন? সরকারী উদাসীনতাও এর জন্য দায়ী। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরসূরী যে টোলগুলি ছিল, সেগুলি অর্থের অভাবে লুপ্ত। সংস্কৃত বিদ্যালয়কে 'সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়'-তে পরিণত হল অনেক আপত্তি ও টালবাহানার পর। যদিও বা বিশ্ববিদ্যালয় হল, সরকারী অনুদানের অভাবে বিল্ডিং তৈরির কাজ শুরুই করা যায় নি, অধ্যাপকের অভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয় না নিয়মিত; যদিও সরকারী টাকায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস তৈরি হয় দেশের নানা প্রান্তে। স্কুলেও সংস্কৃত পড়ানো হয় অষ্টম শ্রেণী থেকে, তাও আবার অধিকাংশ স্কুলে সংস্কৃত ক্লাস নেওয়া হয় খুব কম নতুবা শিক্ষকের অভাবে ক্লাসই নেওয়া হয় না। সরকার উর্দু ভাষার জন্য আলাদা স্বশাসিত সংস্থা তৈরি করতে পারে, মাদ্রাসাগুলিতে আরবী শেখানোর জন্য ঢালাও সরকারী অনুদান দিতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতের বেলা কাঁচকলা। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ইংরেজি মাধ্যমে 'নবোদয় বিদ্যালয়' তৈরি করলেও সংস্কৃত ভাষা গুরুত্ব পায় না। এইরকম বৈষম্য, বঞ্চনা সংস্কৃত ভাষার প্রতি হওয়ার ফলে এটি একটি 'Dead Language'-এ পরিণত হয়েছে। বঞ্চিত হিন্দুদের মত হিন্দুধর্মের প্রাণ সংস্কৃত ভাষাও বঞ্চনার শিকার। আর এটাও এক গভীর চক্রান্ত। সংস্কৃত না জানার ফলে সাধারণ, শিক্ষিত হিন্দুদের কাছে হিন্দুধর্মের মৌলিক সত্যগুলি অজানা থাকার ফলে তারা হিন্দুধর্ম নিয়ে গর্ব অনুভব করে না। নীতিশাস্ত্রগুলি অজানা থাকার ফলে হিন্দু যুবক সম্প্রদায় হয়েছে শ্রদ্ধাহীন ও শৃঙ্খলাহীন।

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে সংস্কৃত ভাষার বিস্তার প্রয়োজন। প্রথমত, সংস্কৃত শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হবে। সরকারী কোষাগারের টাকায় যদি উর্দু ও আরবী পড়ানো যায়, তবে সংস্কৃতও পড়ানো সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ভাষা প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত চালু করতে হবে। তৃতীয়ত, যেসব বেসরকারী সংস্থা সংস্কৃত ভাষার বিস্তারের জন্য কাজ করছে, তাদেরকে সরকারীভাবে সাহায্য করা। চতুর্থত, সমস্ত মঠ ও মিশনে একটি করে 'সংস্কৃত বিদ্যালয়' চালু করা উচিত। পঞ্চমত, প্রত্যেকটি ধনী মন্দিরে যদি একটি করে সংস্কৃত বিদ্যালয় চালু করা, ষষ্ঠত, সংস্কৃত ভাষায় সাপ্তাহিক, মাসিক সংবাদপত্র চালু করলে ছাত্ররা তাদের জ্ঞান অনুশীলনের সুযোগ পাবে।

তবে বর্তমান ভারতের দিকে তাকালে একটু আশার আলো দেখা যায়। ধীর গতিতে হলেও ভারতের নতুন প্রজন্মের সংস্কৃতের প্রতি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। বিবিসি-র সমীক্ষায় ভারতে এমন কয়েকটি গ্রামের নাম উঠে এসেছে, যে গ্রামগুলির নতুন প্রজন্ম সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে। কর্ণাটকের শিমোগা জেলার অন্তর্গত মাত্তুর গ্রামের ৩,৫০০ জন বাসিন্দার প্রায় সকলেই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার ঝিরি গ্রাম, রাজস্থানের বনজরা জেলার গনোদা গ্রাম, ওড়িষার কেওনঝাড় জেলার শ্যামসুন্দরপুর—প্রত্যেকটি গ্রামের বাসিন্দারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন। হিন্দুসমাজ সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তারা তাদের শাস্ত্র ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হবে, গৌরবময় অতীতের কথা জানতে পারবে। তার ফলে 'নতুন ভারত' গঠনের কাজ আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।

আমার প্রশ্নটা একটু বিচিত্র, ... "তবে এতো মোল্লা এই বাংলায় এলো কোত্থেকে...??"

নিহারণ প্রহারণ

এ বাংলায় শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলি পড়েছিল কিনা জানা নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণ এই বাংলায় এসেছিলেন।

না, ...তিনি সশরীরে না এলেও এসেছেন বিদ্যাপতি, জয়দেব এবং চণ্ডীদাসের হাত ধরে। এসেছেন শ্রীচৈতন্যের ভক্তিরসে কিংবা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরোচিত 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এর রাধা প্রেমে।

তাই এই বাংলায় শ্রীনারায়ণ তাঁর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে সজ্জিত হয়ে রুদ্র রূপে আসেন নি। তাঁকে সে বিভঙ্গে পাবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তিনি এসেছেন রাখাল বেশে প্রেমে গদ গদ তাঁর গোপ-গোপিনীদের সমভিব্যাহারে। এসেছেন ননী চোরা রূপে। রাধার পূর্বরাগে তিনি এসেছেন কদম্বের নিভৃত বনে।

এই বাংলায় বংশীধারী শ্রীভগবান কেবল বাঁশি বাজিয়ে আর গরু চরিয়েই দিন কাটালেন...অসি তাঁর আর ধরা হল না...

আর তাঁর সেই গুনাগার দিতে দিতে আমাদের এখন নাস্তানাবুদ অবস্থা। আর সে কারণেই ৪৭'এ একবার ভাগ হয়েও মাত্র ৬০ বছরের মাথায় বাংলা আবার পুনঃ বিভাগের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

একেই বাংলার মাটি নরম। আর এই মাটির সঙ্গে সঙ্গে এখানকার মানুষগুলোর মনটাও বড্ড নরম। এর সঙ্গে এমন এক কাল্পনিক হীনবীর্য কাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সখী ভাব আর নামসঙ্কীর্তন...কালে কালে এই বাংলায় এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশ বহন করে এনেছে।

আমার প্রশ্নটা একটু ভিন্ন রকম...

এই বাংলায় সুলতান মামুদ আসেন নি। মুহাম্মদ ঘোরী আসেন নি আসেন নি আওরঙ্গজেব বা আলাউদ্দিন খিলজী...কিংবা নাদীর শাহ তৈমুর লঙ্গ অথবা আহমেদ শা আবদালী নামের নরপিশাচের দল। এদের কেউ এখানে আসেন নি। তাদের বিচরণ ভূমি ছিল মূলত উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তবে এতো মোল্লা এই বাংলায় এলো কোত্থেকে...?? কই কাশ্মীর ছাড়া উত্তর ভারতের কোথাও তো এই একই কাণ্ড ঘটে নি? এক সুফী সন্ত সেখ শাহ জালাল আর জালালুদ্দিন (যদু) কিংবা কালাপাহাড় এবং হুসেন শাহদের এমন কোন ক্ষমতায় এই বাংলার এমন মারাত্মক পরিণতি হল? ...হতে পারে এরাও দার উল ইসলামের লক্ষে যা যা করণীয় তার সবটাই করতে কোন কসুর করেন নি। তথাপি এটাও সত্যি যে বর্বরতার নিরিখে তারা দিল্লীর বাদশাহদের তুলনায় কিছুটা হলেও পিছিয়ে ছিলেন। তথাপি আজকের দিনে দাঁড়িয়েও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় উত্তর ভারতের তুলনায় ইসলাম এই বাংলায় আঁচড় কেটেছে অনেক গভীর ভাবে। ধারে এবং ভারে উভয় দিকেই। তবে এমনটি হল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের অনেকটা পিছিয়ে যেতে হবে। একটা সময় এই বাংলার বেশিরভাগ মানুষই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। আদিম জনজাতির আদিবাসী ছাড়াও ছিলেন কিছু শৈব মতাবলম্বী মানুষ।

কথিত আছে শৈব রাজা শশাঙ্ক তো একবার মগধ আক্রমণ করে বোধিবৃক্ষই উৎপাটন করে ছাড়েন। তথাপি এটা মানতেই হয় এখানের মাটিতে বৌদ্ধদেরই জয়জয়কার ছিল। অতীশ দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, ধর্মপাল, দেবপাল...বিক্রম শিলা, ও দন্তপুরী মহাবিহার...সর্বোপরি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করে আবেগে আজও কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

হায়...সেদিনও তারা সারা বিশ্বকে জ্ঞানের আলো দেখালেও নিজেরা জানতেন না শুধু ছোট্ট একটা শব্দ...আত্মরক্ষা।

বৌদ্ধ ধর্মে প্রাণী হত্যা মহাপাপ..., এই আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে দেবনাম প্রিয় অশোক এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকেই নষ্ট করে ফেলেন। তাঁর রাজ্যে কোন সেনাদলই ছিল না। এর পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। একাদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ বিনা বাধায় বখতিয়ারের নালন্দা ধ্বংস এবং বাংলা দখল ছিল সেই ক্লীবতারই হাতে গরম ফল।

ভাগ্যিস মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা বা জাপানের মত আরও অনেক বৌদ্ধ দেশ...আজও সে পথে হাঁটেনি। ...তা নাহলে যে কি হত...তা আল্লাহই বলতে পারতেন।

আর ঠিক এই কারণেই আফগানিস্তান সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল...যা একদা মহামতি বুদ্ধের আশীর্বাদ ধন্য, আজ কালের নিয়মে প্রায় বৌদ্ধ শূন্য।

তাহলে বাংলার বৌদ্ধদের কি হল? তারা গেলেন কোথায়? এই উত্তর লুকিয়ে আছে... 'নেড়ে'—শব্দটির মধ্যে। নিজেদের আত্মরক্ষায় অসমর্থ মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধের দল অতি সহজেই তরোয়ালের ডগায় মুসলমান হলেন। আর অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ মূলত নিম্ন বর্ণের মানুষেরা দলে দলে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিবাদের প্রভাবে আবারও সেই একই আত্মরক্ষা বিমুখ আত্মঘাতী বৈষ্ণব মতে ব্রতী হলেন এবং পরবর্তী একসময়ে স্বাভাবিক নিয়মেই ধীরে ধীরে তারাও অনেকেই ইসলামে বিলীন হতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু উত্তর ভারতের মানুষ পুরষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের অথবা বজরঙবলীজীর বীর ভাবটি পেয়েছেন। তাই তারা ইঁটের বদলে পাটকেলটি মারতে জানেন। ...যা তাদের একান্ত রক্ষাকবচ রূপে নিরলস অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেটা বাঙালী হিন্দুর মধ্যে আজও উল্লেখযোগ্য রূপে অনুপস্থিত।

অপর দিকে এখানে আজ ঘটা করে মা দুর্গা কিংবা কালীপূজার আয়োজন করা হলেও ...তা মূলত সর্বক্ষেত্রেই সার্বজনীন আনন্দোৎসবে পরিণত হয়েছে। শক্তি আরাধনার ব্যাপারে তাই আজও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে প্রতিরোধ গড়ার প্রক্রিয়াও হয়েছে সুদূর পরাহত।

একদিকে কাণ্ড জ্ঞান অপেক্ষা দিব্যজ্ঞানের আধিক্য এবং অপরদিকে বৌদ্ধ অহিংসাবাদ, বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ এবং শ্রীকৃষ্ণের যুগল মূর্তির... শনি-রাহু-কেতুর এই ত্রহস্পর্শ যোগ বাঙালী অমুসলমানের কাছে বরাবর এক মূর্তিমান অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ...যা তাদের বিনাশের পথে চিরটাকাল অক্সিজেন জুগিয়ে গেল।

আর ঠিক এই কারণেই ভয়ঙ্কর প্রতিরোধী ...উষর উত্তর ভারতে প্রবল আক্রমণের তুলনায় আপাতদুর্বল আগ্রাসনের মুখেও নির্বিরোধী কোমল এই বাংলায় ইসলাম অতি ব্যাপক হারে সম্প্রসারিত হয়েছে। এখানে সবুজের আজ তাই এই বাড়বাড়ন্ত এবং ...এমনভাবে চললে ভবিষ্যতেও এর গতি রুদ্ধ হওয়া এককথায় অসম্ভবই নয় অবাস্তবও বটে।

ওহে মিঞা আজ সত্যিটা বল/ ছুঁড়ে ফেলে সব ভয়...
রামের বদলে রহিমের রক্ত,/কেন শরীরেতে তব বয়?

ছোটবেলা থেকেই আমরা সবাই ইতিহাস পাতা ছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জেনে এসেছি যে, নাকি ব্রাহ্মণ্য উচ্চবর্ণের ভীষণ অত্যাচারের ফলেই তাবৎ নিম্নবর্ণের অত্যাচারিত হিন্দু, এককালে দলে দলে স্বেচ্ছায় মুসলিম ধর্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ এই ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ইসলামের যে এতো বাড়বাড়ন্ত, তা নাকি এই জাতিবৈষম্যেরই কুফল।

বেশ...। তর্কের খাতিরে মেনেই নিলাম যে, নিম্নবর্ণের মানুষ জাত-পাতের পরাকাষ্ঠায় উচ্চবর্ণের কিছু মানুষ কর্তৃক অবশ্যই অত্যাচারিত হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে...

১. তারা আর সব ধর্ম ছেড়ে প্রথমেই এক বিজাতীয় এবং সম্পূর্ণ অচেনা অজানা ধর্ম... 'ইসলাম' গ্রহণ করতে যাবেন কোন দুঃখে? দেশে কি আর অন্য ধর্মের অভাব পড়েছিল?

২. তাই যদি হবে, তবে বাবা সাহেব আম্বেদকরও তো ইসলাম গ্রহণ করতে পারতেন, তাই না করে তিনি বৌদ্ধ হতে গেলেন কেন?

৩. শিখ, বৌদ্ধ, জৈন...এইসব ধর্মগুলির একটিরও মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আছে কি? তবে এই মানুষগুলিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কেন?

৪. কেনই বা এক সময়ের ১০০% বৌদ্ধ দেশ আফগানিস্তান বা ইন্দোনেশিয়া আজ সম্পূর্ণ ইসলাম অধ্যুষিত?

৫. বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে আজ আর তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দু কয়জন আছেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে বা উচ্চবর্ণের অস্তিত্বসম্পন্ন এই ভারতবর্ষে আজও কয়জন নিম্নবর্ণের দলিত, SC, ST বা OBC ...স্বেচ্ছায় মুসলিম হন?

আসলে ...এটা একটা দীর্ঘকালীন সেক্যুলার Propaganda বা অপপ্রচার ছাড়া আর কিই বা হতে পারে? ইতিহাস বলে কাফের হিন্দু প্রজার উপর জোরপূর্বক অত্যন্ত চড়া হারে রাজস্ব আদায় ছাড়াও জিজিয়া, খরাজ...ইত্যাদি মারাত্মক কর আরোপ, হিন্দু শিশু-মহিলা অপহরণ এবং তরবারির ডগায় জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ—ইত্যাদির মাধ্যমেই সবচেয়ে কার্যকরী হারে এই দেশে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছিল।

রক্তপাতের দিকটা না হয় ছেড়েই দিলাম, শুধুমাত্র নিচের একটি ছোট্ট উদাহরণই আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, ...আপনারাই বিচার করে বলবেন—সেই সব ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে সাধারণ দিনআনা দিনখাওয়া হিন্দুদের মুসলমান হওয়া ছাড়া কি আর অন্য কোন উপায় ছিল?

মোহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব অঞ্চলে হিন্দু রায়তের উপর ফসলের অর্ধাংশ রাজস্ব ধার্য করেন। আওরঙ্গজেব তার রাজত্বকালে পুনরায় হিন্দুদের উপর কোরান নির্দেশিত পথেই প্রাণঘাতী জিজিয়া আরোপ করেন। কেমন ছিল তার পরিমাণ?

উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিন্দুর মাথা পিছু জিজিয়ার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮, ২৪ এবং ১২ দিরহাম। দিরহাম মানে রৌপ্যমুদ্রা। আমরা জানি শায়েস্তা খানের আমলে টাকায় ৮ মন চাল পাওয়া যেত। সে অনুপাত ১ দিরহামে ৮ মন না হোক অন্ততঃ ৪ মন হলেও ১২ দিরহামে ৪৮ মন চাউলের সম পরিমাণ অর্থ একজন সবচেয়ে গরীব হিন্দুকেও বছরে পরিশোধ করতে হত।

এবার ধরা যাক একটি পরিবারে ১০ জন সদস্য আছেন। তবে সেই পরিবারটিকে হিন্দু হবার অপরাধে কত গুনাগার দিতে হবে? —না...৪৮০ মন চাউলের সমপরিমাণ অর্থ। ...আজকের দিনেও ভাবতে পারেন?

এই অর্থ পরিশোধ করতে না পারার অর্থ তাকে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য হওয়া। এবং এই কর না দিতে পারার কারণেই ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক ইসলামে দীক্ষিত হতে এককালে বাধ্য হয়েছেন।

এই বাস্তব সত্যটা স্বীকার করে নিতে অনেকেরই বুকের ভিতরটা টনটন করে ওঠে।

যারা সেইসময় প্রতিরোধ তৈরি করতে পেরেছেন, ...তাদের বংশধরেরা আজও মাথা উঁচু করে হিন্দু নামে বেঁচে আছে। বাকিরা আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছেন। আজকের এই বাংলার মুসলমান সমাজ যদি জানতে পারেন যে, তাদের পূর্বপুরুষদের দল কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের হৃদয় ইসলামের প্রতি বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে যাবে। আর খানিকটা হচ্ছেও তাই।

সেই কারণেই হুমায়ুন আজাদ, গিয়াসুদ্দিন...তসলিমা... রাজীব হায়দার রা ...জন্ম নিয়েছেন। ...তাদের মত বহু মানুষ এগিয়ে এসেছেন। তারা প্রতিবাদে ফেটে পড়ছেন। তাদের উপর জেহাদি আক্রমণ নেমে এসে তাদের কণ্ঠরোধের অপ্রয়াস সত্ত্বেও দিনে দিনে আরও যুক্তিবাদী মানুষ এগিয়ে আসছেন।

একটি অবাস্তব প্রেমের গল্প

সুন্দরগোপাল দাস

দিনের শেষে হাটের মাঝে
বসলে তুমি পসরা নিয়ে,
গেছে সবই ফুরিয়ে আজ
মনের মানুষটিকে দিয়ে।
একদিন যাকে ভালোবেসে
এ জীবন-মন সকলই দিলে,
তবু সে গেল চলেই দূরে
ফিরল না আর তোমার কুলে।
তারপরেতে যে দিন যে যায়, রাত যায়
বছর আসে বছর যে যায়,
রূপের হাটের বিকিকিনি
রূপ বিকিয়ে পয়সা পায়।
ভালোবাসার সন্ধানেতে
সেই ছেলেটি ঘুরেই মরে,
দেশ থেকে দেশান্তরে
দিন কেটে যায় পথের 'পরে।
সাঁঝের বেলা ক্লান্ত পথিক
ফিরে আসে আপন ডেরায়,
বৃথাই গেল দিনগুলি তার
ভিন্ন দেশের পথে ফেরায়।
এদিকেতে সেই মেয়েটির
বয়স বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ,
দিন কাটে তার উপবাসে
পেটে জ্বলে ক্ষিদের আগুন।
শেষে একদিন সব ভোলে সে
ভালোবাসার ভীষণ জ্বালা,
ক্ষিদের কাছে নতিস্বীকার
এবার অভিনয়ের পালা।
এসে হাজির হয় সে হাটে
রং মাখা সব পসারদার,
যৌবন যার যত বেশি
তারই বেশি খরিদ্দার।
সেই মেয়েটির দিন বৃথা যায়
যৌবন তার গেছে টুটে;
খোদ্দের তার জোটে না কেউ
কেউ ডাকে না দরজা ঠুকে।
উপসে তার দিন কেটে যায়
সময় যায় যে হাত গুণে,
শীর্ণ শরীর ভেঙে পড়ে
দেয় না দুমুঠো কেউ ভুলে।
এদিকেতে সেই ছেলেটির
শেষমেশেতে হল বিকার,
প্রকৃত প্রেম পেয়েছিল সে
এতদিনে করল স্বীকার।
একদিন যারে অবহেলে
ফেলেছিল পথের পরে,
সেই তার ধন সেই তো জীবন
কোথায় পাব আজকে তারে।
হন্যে হয়ে খোঁজে যে সে
পুরানো সেই শহর ঘিরে,
দেখতে পেলে আদর করে
আপন করে আনবে ঘরে।
ঘুরতে ঘুরতে হাজির হয় সে
পসারিণীর সেই হাটে,
দূরে দেখে এক রমণী
বসে আছে আপন বাটে।
ধীর পায়ে কাছে এসে
তুলে ধরে সেই শীর্ণ মুখ,
আচম্বিতে রক্তে লাগলো দোলা
আশার দোলায় ভাসল বুক।
আনন্দে সে আজ বাক্যহারা
গন্ড ভেজায় অশ্রুধারা।
সব পেয়েছিস দেশটা পেয়ে
আনন্দে সে আজ আত্মহারা।
মুখটি তুলে দেখ গো প্রিয়া
বলে ছেলেটি, একটিবার
এসেছি আজ তোকে নিতে
ভালোবাসাকে করে স্বীকার।
মেয়েটি শেষে চিনতে পেরে
বলে ওগো মোর প্রিয়,
দেবার মতো নেই তো কিছু
ভেঙেছে মন, শীর্ণ দেহ।
একটি পয়সা দিয়ে যাও
ভুক্ত রমণীরে,
ভুলতে যদি পারিস তবে
ভুলিস পসারিণীরে।
মৃদু হেসে ছেলেটি তার
ওষ্ঠ করে চুম্বন,
বলে শুধু একটি কথা
শোন প্রেয়সী দিয়ে মন।
পয়সার চেয়ে অনেক বড়
দেব একটা আশা
তোমার হাতে সঁপে দিলাম
এ জীবন, আর ভালোবাসা।

তৃতীয় আমেরিকা সফর ঃ বহির্ভারত জাগছে

তপন ঘোষ

বহির্ভারত জাগছে। তৃতীয়বারের এই সদ্য আমরিকা সফরের পর এটাই আমার অনুভূতি। ২০১০ এবং ২০১১-র পর এবছর সেপ্টেম্বর মাসে তিন সপ্তাহের জন্য আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ পেলাম। ১১, ১২, ১৩ সেপ্টেম্বর নিউ জার্সিতে হিন্দু স্টুডেন্টস্ কাউন্সিল আয়োজিত 'গ্লোবাল ধর্ম কনফারেন্স'-এর আয়োজকদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম একটি প্লেনারী সেশনে বক্তব্য রাখার জন্য। বিষয় ছিল 'ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু নির্যাতন'। বক্তব্যের থেকেও আমার আগ্রহ বেশি ছিল সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত, মেলামেশা ও ভাব বিনিময়ের জন্য। সেটা পুরোপুরি হয়েছে। আমেরিকার বহু পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। বহু নতুন পরিচয় হয়েছে। আর স্যোশাল মিডিয়ার কল্যাণে দেখলাম যে অনেকেই আমাকে চেনে যাদেরকে আমি চিনি না। বার বার অনুভব করতে লাগলাম, স্যোশাল মিডিয়া না থাকলে মুসলমান ও খ্রীষ্টানের দালাল বদমায়েস সেক্যুলারবাদীরা আমাকে গুঁড়িয়ে দিত।

এবারের সফরে আমেরিকার মোট সাতটি স্থান ভ্রমণ করেছি। নিউ জার্সি, নিউইয়র্ক, ডালাস, ওয়াশিংটন ডিসি, শিকাগো, হিউস্টন ও ক্যালিফোর্নিয়া। শহর ধরলে আরও কয়েকটি। যেমন নিউইয়র্কে ম্যানহাটন ও কুইন্স, হিউস্টনে সুগারল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসে ও ফ্রীমন্ট। ধর্ম কনফারেন্স ছাড়াও ছোট বড় সভা করেছি মোট আটটি। মোট ন-টি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে। এছাড়া অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করতে হয়েছে। এরমধ্যে লাঞ্চ আর ডিনারগুলো বাদ যায়নি। ওয়াশিংটনে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেছি। তিনি যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে সব নোট নিয়েছেন।

আমেরিকায় আমার মেলামেশা ও আদানপ্রদান বেশিরভাগটাই প্রবাসী ভারতীয় হিন্দুদের সঙ্গে হয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়, অর্থাৎ যাদের জন্ম আমেরিকায়—তাদের সঙ্গেও হয়েছে। তাদের চিন্তা ও মানসিকতা অবশ্যই আগের প্রজন্মের থেকে আলাদা। তবে তারাও ভারতের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত। এটা আমাকে আশ্বস্ত করেছে।

এবার আমার আমেরিকা সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল ক্যালিফোর্নিয়াতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

কার্যক্রম দেখা। ওখানে কার্যক্রম বা সভাকে 'ইভেন্ট' বলে। মোদীজীর দুটো ইভেন্ট আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে, উদ্বেলিত করেছে। আমার সফরের শেষ লগ্নে ২৫ সেপ্টেম্বর আমি ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছেছি। ওইদিনই ফ্রীমন্ট হিন্দু মন্দিরে আমার জন্য কর্মসূচী (ইভেন্ট) আয়োজন করেছিল আমার তরুণ বাঙালি বন্ধুরা। আঙুলের ডগা দিয়ে যারা পৃথিবীতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসছেন সেই সফট্ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে বাঙালি প্রতিভার অভাব নেই। নিজ জীবনে তারা সবাই প্রতিষ্ঠিত ও কেরিয়ারে উজ্জ্বল। সেইরকমই কয়েকজন উৎসাহী কর্মীর প্রচেষ্টায় বাঙালি ও অবাঙালি অনেকেই আমার ২৫ সেপ্টেম্বর সভায় এসেছিলেন। এসেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি। তারমধ্যে অন্যতম ডঃ রমেশ জাপা। সংঘ পরিবারেরও অনেক কর্মকর্তা বিভিন্ন স্থানে আমার কর্মসূচীতে এসেছেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর যাদের কথা উল্লেখ না করলে অপরাধ হয়ে যাবে তারা হলেন আমার সমর্থকদের পত্নীরা। এঁরাও প্রায় সকলেই চাকরি করেন। বাড়িতে বাচ্চাদের দেখাশোনা করেন, রান্নাঘর সামলান। তারপরেও তাঁরা সমান উদ্যমে স্বামীদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে কারও কারও পিতৃগৃহে অন্য রাজনৈতিক আদর্শের পরিবেশ আছে। কিন্তু আমেরিকায় এঁরা স্বামীদের সহযাত্রী। এছাড়া আমার প্রতি তাঁরা অতি স্নেহশীলা। আমার সুবিধা অসুবিধা দেখাশোনায় তাঁরা কোন ত্রুটি রাখেননি।

এবারের সফরে হিউস্টনের অনুষ্ঠান বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। বাঙালির প্রাণকেন্দ্র দুর্গাবাড়িতে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার। অনেক বাঙালি ও অন্য ভাষাভাষী লোকও আমাদের সভায় এসেছিলেন। সকলকে নিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় দুর্গামন্দিরে আরতিতে অংশগ্রহণ করলাম। মা দুর্গার অপূর্ব মূর্তি মন ভরিয়ে দিল। পুরোহিত মশায় আলাদা করে আমাকে দিয়ে অঞ্জলি দেওয়ালেন ও মায়ের প্রসাদ দিলেন। আরতির পর পাশের হলঘরে আমার বক্তব্য, পাওয়ার পয়েন্ট ও প্রশ্নোত্তর। তারপর রাত্রিভোজন ওখানেই। এবারই প্রথম অনুভব করতে পারলাম যে উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত আমেরিকাবাসী বাঙালিরাও পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর অবস্থা নিয়ে চিন্তিত। তাঁরা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামিক আগ্রাসনের হাত থেকে বাঁচাতে তাঁরা কী করতে পারেন। আমার সাধ্যমত তাঁদেরকে উত্তর দিয়েছি।

নিউইয়র্কে একটি সাধারণ সভা এবং একটি সভা হয়েছে বাংলাদেশী হিন্দুদের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে আমার মনের মিল আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। নিউইয়র্কে 'আই টিভি'র স্টুডিওতে গিয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছি। নিউইয়র্কের সব অনুষ্ঠানেই নারায়ণ কাটারিয়ার (সিন্ধ থেকে আগত উদ্বাস্তু) সক্রিয় সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। ডালাস, শিকাগো এবং ওয়াশিংটনেও আমাদের সমর্থকরা খুব উৎসাহ নিয়ে সব কর্মসূচী আয়োজন করেছিলেন।

এবার আসি ২৭শে সেপ্টেম্বর মোদীজীর কার্যক্রমের কথায়। সকাল ন'টায় ফেসবুক মীট, সন্ধ্যায় বিরাট স্টেডিয়ামে জনসভা। দুটোর জন্যই আগে থেকে পাস দেওয়া হয়েছে। পাস পাওয়া সহজ ছিল না। স্টেডিয়ামের ১৮ হাজার আসনের জন্য ৪৬ হাজার দরখাস্ত এসেছিল।

সকাল ৯টায় ফেসবুক ক্যাম্পাসে আয়োজন। সিকিউরিটির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, কিন্তু বাড়াবাড়ি নেই। প্রত্যেকের জন্য পাস এবং সরকারী আই-কার্ড বাধ্যতামূলক। আমাদের জন্য পাসপোর্ট। ওটা ফেসবুকের সদরদপ্তর। প্রাঙ্গণে খোলা মাঠে নীচু মঞ্চ। সামনে প্রায় ৬০০ চেয়ার। তার পিছনে একটু উঁচু লম্বা প্ল্যাটফর্মে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার অবস্থান। ভারতের ইংরাজি ও হিন্দি প্রত্যেকটি প্রধান টিভি চ্যানেলের ক্যামেরা ও অ্যাঙ্কররা উপস্থিত। সব চেনা মুখ। মোদীজী আসার আগে দর্শকদের সাক্ষাৎকার। ক্যালিফোর্নিয়ার মনোরম আবহাওয়ায় রৌদ্র উজ্জ্বল সকালে উৎসাহী ও আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় দর্শক। সঙ্গে কৌতূহলী সাদা চামড়ার দর্শক। ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জুকেরবার্গ (বয়সে তরুণ) মোদীজীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তুমুল করতালির কথা বারবার বলতে গেলে লেখা অকারণে দীর্ঘ হবে। তাই পাঠক বুঝে নিন, মোদীজীর প্রত্যেকটি কথার পর করতালি। অনুষ্ঠানে মোদীজীর টানা বক্তৃতা ছিল না। মার্ক জুকেরবার্গ মোদীজীকে প্রশ্ন করছেন ইংরাজিতে। মোদীজী উত্তর দিচ্ছেন হিন্দিতে। দুদিকে দুটি বড় পর্দায় তা সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজিতে অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে। জুকেরবার্গের কয়েকটা প্রশ্ন ছিল স্যোশাল মিড়িয়া সম্পর্কিত। তারপর দর্শকদের মধ্যে থেকে কয়েকজন (সম্ভবতঃ পূর্ব নির্ধারিত) প্রশ্ন করলেন। তাঁদের প্রশ্নগুলি ছিল আর্থিক উন্নয়ন, মেক ইন ইন্ডিয়া ও নারী সম্মান সম্পর্কিত। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে মোদীজী ক্রিকেটের ছয় আর চার মেরেছেন। সত্যি অসাধারণ। এবং উত্তরে কোথাও আপোষের মনোভাব নেই। হীনমন্যতার ছোঁয়াটুকু পর্যন্ত নেই। 'তৃতীয় বিশ্ব', 'উন্নয়নশীল দেশ' প্রভৃতি পরিভাষাগুলি কেন দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—মোদীজীকে দেখলে, মোদীজীর কথা শুনলে তা বোঝা যায়। তবে জুকেরবার্গের একটা গুগলি মোদীজী ভালোভাবে সামলাতে পারলেন না। জুকেরবার্গ মোদীজীর

মায়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন। প্রথমে মোদীজী সাবলীল ছিলেন। তিনি বললেন যে দর্শকের মধ্যে জুকেরবার্গের মা-বাবা উপস্থিত আছেন। তাঁরা একবার উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে দেখা দিন যাতে সকলে এক কৃতী সন্তানের পিতামাতাকে দেখতে পান। তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন সামনের সারি থেকে নয়, মাঝখানের সারি থেকে। তাঁদেরকে প্রণাম জানিয়ে মোদীজী নিজের মায়ের কথা শুরু করলেন। কিন্তু সামলাতে পারলেন না। প্রায় ৩ মিনিট তাঁর বাকরুদ্ধ ছিল। তারপর কান্নাভেজা গলায় বললেন যে সন্তানদের মানুষ করার জন্য তাঁর মা প্রতিবেশীদের বাড়িতে বাসনমাজার (বর্তনসাফ) কাজও করেছেন। আর তিনি চা বিক্রি করেছেন। তখন উপস্থিত এক হাজার দর্শক অনেক কষ্টে নিজেদের সামলাচ্ছেন।

এখানে আমি পাঠকের কাছে অনুমতি নিচ্ছি এই ঘটনায় আমার অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা তুলে ধরতে।

মোদীজীর এই আবেগ সামলাতে না পারা, ভেঙে পড়া—এগুলো তাঁর ছোটবেলায় মায়ের কষ্টের কথা ভেবে নয়। মায়ের কষ্টের কথা তো তাঁর সবসময় মনে থাকে। অনেক জায়গায় বলেছেনও সেই কথা। তাই তাঁর মত ইস্পাত-নার্ভের মানুষের তো এতে ভেঙে পড়ার কথা নয়। তাহলে কেন পড়লেন? আমার অনুভূতি থেকে পাওয়া উত্তর অন্যরকম। যে মা তাঁর সন্তানকে মানুষ করার জন্য এত কষ্ট করেছেন, সেই সন্তান আজকে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছে, ভারতগৌরব হয়েছে, সুখসুবিধা প্রাপ্তির চূড়ায় পৌঁছেছে, কিন্তু সেখানে পৌঁছেও তার দুঃখী মা-কে এই বৃদ্ধ বয়সেও একটু সুখ দিতে পারছেন না, একটু সম্মানের ব্যবস্থা করে দিতে পারছেন না, দিল্লীর প্রধানমন্ত্রী আবাসে নিয়ে এসে রাখতে পারছেন না—এমনই কঠোর সাধনায় রত তিনি। এটাই যে তিনি ছোটবেলা থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখায় প্রতিদিন প্রার্থনা উচ্চারণ করতে গিয়ে সংকল্প করেছেন—"যৎ কন্টকাকীর্ণ মার্গং স্বয়ং স্বীকৃতং নঃ" (নিজেই বেছে নেওয়া এই কন্টকময় রাস্তা)। বংশবাদ, স্বজনপোষণ, চাটুকারপ্রিয়তা এবং এসব থেকে জন্ম নেওয়া ভয়ঙ্কর দুর্নীতি ও নীতিতে আপোষ (compromise in policy making including defence policy) ভারতমাতার শরীরকে জীর্ণ করে দিয়েছে, রুগ্ন করে দিয়েছে। ফলে তার সন্তানরাও হচ্ছে রুগ্ন, দুর্বল (শুধু শারীরিকভাবে নয়, চরিত্র, মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাসে)। সেই ভারতমাকে সুস্থ সবল করতে হলে যে তার সাধক পুত্রকে অনেক কষ্ট করতে হবে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, কঠোর তপস্যা করতে হবে। সেই তপস্যারই তো অঙ্গ নিজের জন্মদাত্রী মা'কে কষ্ট দেওয়া, কষ্ট দিয়ে নিজে কষ্ট পাওয়া।

এ কষ্ট কি কাউকে বোঝানো যাবে? বুকে মোচড় দেওয়া এই কষ্ট, দেশমাতৃকার জন্য জন্মদাত্রী মা'কে কষ্ট দেওয়ার এই কষ্ট—এতেই মোদীজী সেদিন জুকেরবার্গের সামনে ভেঙে পড়েছিলেন। জড়বাদী আমেরিকায় মা-বাবার সঙ্গে বড় হয়ে যাওয়া সন্তানের সম্পর্ক অনেক অনেক অনেক কম। তাও সেখানে জুকেরবার্গের মা-বাবা এসেছেন কৃতী সন্তানের সাফল্যকে দেখতে (কে জানে মোদীজীই তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিনা?)। অথচ দেশগৌরব মোদীজী তাঁর মা'কে কোথাও নিয়ে যাচ্ছেন না, সম্মানের ভাগীদার করছেন না—এ কি যোগ নয়? সাধনা নয়? তপস্যা নয়? এর থেকে বড় তপস্যা কঠিন তপস্যা ক'জন সাধু সন্ন্যাসী করেন? করলে হিন্দু ধর্মের হিন্দু সমাজের হিন্দু দেশের আজ এই হাল হত না।

মোদীজী ও তাঁর মায়ের কথা লিখতে গিয়ে আমিও কি কিছুটা আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম? কে জানে! কিন্তু ২৭ তারিখ বিকালের কথা যে না লিখলেই নয়। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের বে'এরিয়া (Bay Area) সান জোসে শহরে SAP সেন্টার স্টেডিয়ামের বাইরে ও ভিতরে সে যে এক ভারত দর্শন! এ ভারত বহির্ভারত, কৃতী ভারত, মায়ের কোল থেকে দূরে থাকা ভারত। চোখ ভরে গেল, প্রাণ ভরে গেল, মন ভরে গেল।

ফেসবুক থেকে ফিরে এসেছি জয়দীপের বাড়িতে। দুপুর থেকেই সেখানে সাজ সাজ রব। ভাত খাওয়ার আগেই জয়দীপের স্ত্রী মাম্পি শাড়ি পড়ে নিয়েছে। চার বছরের ছোট মেয়েকে ডে-কেয়ার সেন্টারে রেখে আসতে হবে। সেখানে যুধাজিৎ, অনির্বাণ ও শান্তনুর বাচ্চারাও থাকবে। প্রতি বাচ্চা ১০০ ডলার। ৬-৭ ঘণ্টা বাচ্চারা স্টেডিয়ামে কাটাতে পারবে না। তাছাড়া আমাদের বঙ্গসন্তানেরা তো শুধু মোদীজীকে দেখতে ও শুনতে যাচ্ছে না! আরও অনেক কিছু ব্যাপার আছে যে! গোটা ভারতের মিডিয়া থাকবে। তারা তো বেশিরভাগই সেক্যুলার, হিন্দুবিরোধী। গত মে মাসে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে মোদীজীর ঐতিহাসিক কার্যক্রমকে NDTV-র বদমায়েস সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই শুধু গুজরাতিদের অনুষ্ঠান বলে দেখানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মোদী সমর্থকরা তাকে এমন ঘষে দিয়েছিল যে এবার আর সে আসেনি। ক্যালিফোর্নিয়ার ভারতীয় যুবকরা তার জন্য বিশেষভাবে অপেক্ষা করছিল। তারা হতাশ হয়েছে। কিন্তু ভারতের মিডিয়াকুলে সেকু-মাকুর তো অভাব নেই! বিগত ১২ বছর ধরে তারাই তো মোদীজীকে নরখাদক রাক্ষস রূপে বিশ্বের সামনে তুলে

ধরেছিল। সেই মোদীজীকে ২০১৪-র নির্বাচনে ভারতবাসী মাথায় তুলে নিলেও এদের লজ্জা নেই। এরা দুকান কাটা। তাই তাদের সামনে দেখাতে হবে যে মোদীজী সারা ভারতের প্রিয়, বাংলা-বাঙালিরও প্রিয়। তাই বাঙালি সাজে সেজে, আমাদের যুবক বন্ধুরা জোড়ায় জোড়ায় রেডি। হাতে 'মোদীজী স্বাগতম্' ব্যানার নিয়ে দাপিয়ে বেড়াবে। ঢাকও রেডি। দুনিয়াকে দেখাতে হবে মোদীজী বাঙালিরও প্রিয়।

ঠিক সেইরকমই হল। স্টেডিয়ামে মোদীজী আসবেন সন্ধ্যা ৭টায়। দুপুর ২টা থেকেই স্টেডিয়ামের বাইরে জমায়েত শুরু হয়ে গেছে। সব বাচ্চাদেরকে ডে-কেয়ার সেন্টারে জমা করে আমরা সাড়ে তিনটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। স্টেডিয়ামের পাশে একটা পার্কে মিডিয়া সেন্টার হয়েছে। সেখানে বিরাট পর্দা লাগানো আছে। যারা স্টেডিয়ামে ঢুকতে পারবে না, তারা ওখানে পর্দায় দেখতে পাবে।

এদিকে পার্কে মিডিয়া সেন্টারের সামনে কিছু খালিস্তানপন্থী শিখ জড়ো হয়েছে। তাদের হাতে মোদী বিরোধী স্লোগানের ব্যানার। পুলিশ মাঝখানে ব্যারিকেড করেছে। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যায় মোদী সমর্থক। অনেক রাজ্যই (ভারতের) তাদের নিজস্ব পোষাক পড়ে এসেছে। হাতে রংবেরংয়ের ব্যানার। তবে সব থেকে বেশি দৃষ্টি কেড়েছে মারাঠিরা। ছেলে ও মেয়ে সকলের মাথায় গেরুয়া পতাকা। তাদের হাতেও ঢাক। তবে একটু অন্যরকমের। সাদা পোষাক, গেরুয়া পাগড়ি, গেরুয়া কোমরবন্ধনী। হাতে ঢাকগুলো নিয়ে যে ভঙ্গিতে বাজাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল যেন শিবাজীর সেনাবাহিনীর বাদ্যদল। আর মেয়েদের হাতে লেজিম। তিন লাইনে দাঁড়িয়ে নেচে নেয়ে অষ্টতাল বাজাচ্ছিল। আর এস এস থেকে এগুলো আমার জানা। আরও কত রাজ্যের কত দল। আমাদের বাঙালি বীররা কম যায় না। ব্যানার ও ঢাক তো আছেই। একটা হ্যান্ডমাইকও জোগাড় করেছে। হঠাৎ যুধাজিৎ স্লোগান দেওয়া শুরু করল—ভালোবাসি ভালোবাসি, মোদীজীকে ভালোবাসি। রহস্যটা হল এই যে সারা ভারতের অ-বাংলাভাষী মানুষেরা কমপক্ষে দুটো বাংলা কথা জানে। (১) আমি তোমাকে ভালোবাসি, (২) রসগোল্লা। বাঙালির ও-কারাত্মক গোল গোল উচ্চারণের সঙ্গে ভারতবাসী পরিচিত। তপন আমাদের উচ্চারণে তপোন হয়ে যায়। তাই 'মোদীজীকে ভালোবাসি' স্লোগানে সবাই বুঝতে পারবে যে এরা বাঙালি। বাঙালিও মোদীভক্ত, মোদীবিশ্বাসী। দুনিয়াকে এই বার্তা দিতে আমাদের ছেলেদের ও তাদের বৌদের তৎপরতার কোন অভাব ছিল না। Times Now লাইভ দেখাল।

আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসে'র ময়দানে সেদিন তৈরি হয়েছিল এক ক্ষুদ্র ভারত। সেই উৎসাহ, উদ্দীপনা, উৎসবের মেজাজ, তারই মধ্যে সংকল্পের চিহ্ন—এসব দেখে আমার একটাই কথা শুধু মনে আসছিল। এটা ভারত উৎসব। আমেরিকায় ভারত উৎসব। বহির্ভারতে ভারত উৎসব। আর বারবার মনে হচ্ছিল—একটা মাত্র মানুষকে ঘিরে এই উৎসব, এই উচ্ছ্বাস, এই উদ্দীপনা। ছোটোবেলা থেকে সযত্নে লালন করা একটা বিশ্বাস আমার অনেক আগেই টলে গিয়েছে। ব্যক্তি নয়, সংগঠন বড়। নাঃ, মোদীজী একা (অন্যের দ্বিমত থাকতে পারে) বহির্ভারতকে যেভাবে জাগিয়েছেন তাতে আর ব্যক্তিকে ছোট করে দেখা যায় না।

যাক, বিকালের অনুষ্ঠানের ছিল তিনটে পর্যায়। প্রথম পর্যায়—ওই যে বললাম, স্টেডিয়ামের বাইরে ভারত উৎসব। দ্বিতীয় পর্যায় স্টেডিয়ামের ভিতরে প্রায় দেড়ঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তৃতীয় পর্যায় মোদীজীকে সম্বর্ধনা ও তাঁর ভাষণ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কথাও না বললেই নয়। বিশাল লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সিকিউরিটি চেক্ পার করে স্টেডিয়ামে ঢুকলাম। আমার কাছে সাধারণ পাস ও ভিআইপি পাস দুটোই ছিল। কয়েকজন হোমড়া চোমড়ারা আমাকে ভিআইপি ব্লকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু, আমি বাঙালি দলের সঙ্গ ছাড়লাম না। আমার এই বাঙালিপ্রীতি হয়তো তাঁদের ভালো লাগেনি। কিন্তু পরে দেখলাম ভিআইপি ব্লকে না গিয়ে ভালোই করেছি। ১৮ হাজার আসনের এই বিশাল ইন্ডোর স্টেডিয়ামের একদম নীচে তো মঞ্চ হয়েছে। তার চারিদিকে মাটিতে চেয়ারে ভিআইপি-রা। আর আমরা উঁচু গ্যালারিতে। উঁচুতে বসায় গোটা স্টেডিয়ামের চেহারাটা একসঙ্গে দেখা যাচ্ছিল।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কোরিওগ্রাফিতে ৫-৬টা নৃত্য। সবগুলোই ভারতীয়। গরবা বা ভাংড়া ছিল না। তারপর কৈলাস খেরের গান। এর মধ্যে তিনটি নাচ (গ্রুপ) আমার এত ভালো লাগল, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ভারতে এত ভাল কোরিওগ্রাফি দেখেছি বলে মনে পড়ল না। কেবল মনে হতে লাগল, যদি কোনদিন ভারত ধ্বংস হয়ে যায়, যদি কোনদিন গান্ধার-সিন্ধের মত ভারতেরও সভ্যতা হারিয়ে যায়, তবু আমাদের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদ এই আমেরিকায় বেঁচে থাকবে। আমাদের পূর্বপুরুষদের হাজার হাজার বছরের শিল্পসাধনার সৃষ্ট সম্পদ থেকে মানবজাতি বঞ্চিত হবে না।

এরপর তৃতীয় পর্যায়। বিপুল করতালি ও ১৮ হাজার দর্শকের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে মোদীজী মঞ্চে আসার

আগেই একে একে মঞ্চে আসতে লাগলেন ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য থেকে নির্বাচিত আমেরিকার পার্লামেন্টের সদস্যরা। এঁদেরকে ওখানে বলে কংগ্রেসম্যান অথবা সেনেটর (সিনেট সদস্য)। এঁদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকার রাজনীতিতে প্রচণ্ড প্রভাবশালী ন্যান্সি পেলোসী এবং খ্রীষ্টান থেকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করা তুলসী গাবার্ড। বাকিদের নাম মনে নেই। ১১ জন সেনেটর মঞ্চে লাইন করে দাঁড়ালেন। তারপর ঢুকলেন মোদীজী। উচ্ছ্বাস বাঁধ ভাঙল। বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১১ জন এম.পি. আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানাতে স্টেডিয়ামে উপস্থিত দেখে বহির্ভারতবাসীর বুকের ছাতি যেন ছাপান্ন ইঞ্চি হয়ে গেল।

সম্বর্ধনার পর এম.পি.রা মঞ্চ থেকে নীচে নেমে গিয়ে প্রথম সারিতে বসলেন। তারপর শুরু হল মোদী ম্যাজিক। ১৮ হাজার শ্রোতাকে যেন মোদীজী তাঁর মনের তারের সঙ্গে বেঁধে নিলেন। বললেন, সিলিকন ভ্যালীর ভারতীয় যুবক যুবতীরা শুধু আঙুলের খেলায় গোটা বিশ্বে ভারতের স্থান অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছেন। একে তিনি 'ব্রেন ড্রেন' বলে মনে করেন না। তিনি একে 'ব্রেন গেন' (Brain gain) বলে মনে করেন। তিনি তাঁর বিশ্বাস প্রকাশ করলেন যে ভারতমাতার এই কৃতী সন্তানেরা প্রয়োজন পড়লেই ফিরে গিয়ে দেশমাতৃকার সেবা করবে। মোদীজী দর্শকদের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট চাইলেন। বললেন, ভারতে তো শত কোটি, হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির কথা শুনতে সবাই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু গত ১৬ মাসে তাঁর সরকারের কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনরকম আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে কিনা? সমস্ত দর্শক একবাক্যে উত্তর দিল—না, ওঠেনি। মোদীজীর বক্তৃতার সবটা তুলে ধরার স্থান এটা নয়। কিন্তু ওই SAP স্টেডিয়ামে সেদিনের সভায় আমার একটা পর্যবেক্ষণের কথা বলে শেষ করব।

বিরাট ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একেবারে নীচে মঞ্চ। আমি অনেক উপরে গ্যালারিতে। মঞ্চের ঠিক উপরে স্টেডিয়ামের ছাদ থেকে ঝোলানো বিশাল বক্স-পর্দা। একটা বিশাল চারকোণা বক্সের চারদিকে চারটে পর্দা যাতে গোল স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসা দর্শক সব জায়গা থেকেই দেখতে পায়। মঞ্চের ছবি সেই পর্দায় বিরাট আকারে ফুটে উঠছিল।

মোদীজীর বক্তৃতার এক একটা বাক্যের পর যখন গ্যালারিতে করতালির ঝড় উঠছিল, তখন মাঝে মাঝে ক্যামেরা ওই নীচে বসা এম.পি. দের মুখে ফোকাস করছিল। সেই ছবি পর্দায় বড় করে ফুটে উঠছিল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে, তাঁদের মুখের মানচিত্রগুলো যেন বেঁকেচুরে যাচ্ছিল। সেই মুখে খুশী নেই, আবেগ নেই, প্রশংসা নেই। আছে এক বিস্ময়। আর তার সঙ্গে আরও কিছু যা আমি বর্ণনা করতে পারব না। তাঁদের ওই বিস্মিত ও বিকৃত মুখভঙ্গি দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে এরা তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। অথচ তাঁরা যে ভয় পেতে পারেন, নিজেরাই তা বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিসের ভয়? বিশ্ব রণাঙ্গনে এক শক্ত প্রতিযোগী এসে যাওয়ার ভয়। সোভিয়েতের পতনের পর দ্বিমেরু (Bi-polar) বিশ্ব একমেরু বিশ্বে পরিণত হয়েছিল। আমেরিকাই ছিল সেই মেরু। তারপর চীনের উত্থান আমেরিকাকে কিছুটা ভাবিয়ে তুলেছিল। কিন্তু চীনও পিছিয়ে পড়ছে। আমেরিকার সামনে কোন প্রতিযোগী, কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। মোদীজী তাদের সেই নিশ্চিন্ততায় আঘাত হেনেছেন। ভারতীয়দের মেধা, দক্ষতা, শৌর্য, বীর্য তারা জানে। কিন্তু এদের আত্মবিশ্বাস নেই। তাই তারা নিজের দেশের উন্নতি করতে পারে না। প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে না। আড়াইশ বছর ধরে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মেধা লুট করেই তো ইউরোপ আমেরিকা উন্নত হয়েছে। কিন্তু এই নেতা (মোদী) যেভাবে তাঁর দেশের মানুষকে, প্রতিভাবান যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করছেন, উদ্দীপিত করছেন—তাতে ভারত আবার তার আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পাচ্ছে। এই ভারতই তো একসময় বিশ্বগুরু ছিল। সবথেকে সমৃদ্ধ দেশ ছিল। হাজার বছরের দাসত্ব তার আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে দিয়ে এক হীনমন্য জাতিতে পরিণত করে দিয়েছিল। সেই জাতি যদি আবার তার হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠে, তাহলে আমেরিকার দাদাগিরির আসনটা টলমল করে উঠবে—এই এক অবিশ্বাস্য আশঙ্কায় ওই কংগ্রেসম্যানদের মুখের ভূগোল বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। আমার খুব মজা লাগছিল।

আমেরিকায় যা দেখে এলাম, যা শুনে এলাম, যা বুঝে এলাম, তা হল এই যে ভারত আবার জাগছে। তবে সে জাগরণ শুরু হয়েছে বহির্ভারতে। দেখা যাক সে জাগরণের ঢেউ ভারতে কবে পৌঁছায়।

২৭ সেপ্টেম্বর রাতটা যেন একটা আবেশে কাটল। ২৮ তারিখ সকালে সান ফ্রান্সিসকো বিমানবন্দর থেকে বিমান ধরে আবুধাবিতে বিমান পাল্টে ২৯ তারিখ রাত্রে কলকাতা। ঘরের ছেলে ঘরে।

ঈদের কুরবানী, হিন্দুদের হয়রানি

ইসলাম ধর্মমত অনুযায়ী কুরবানী একটি অতি পবিত্র পরব। 'কুরবানী' শব্দটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'আত্মবলিদান'। আল্লার সেবক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে, নিজেকে অথবা নিজের অতি প্রিয় কাউকে কুরবানী-র জন্য উৎসর্গ করতে হয়। মাইথোলজির কচ্‌কচানিতে গেলাম না, কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানরা কুরবানী করে আসছে বকরী ঈদের দিন। কিন্তু ইসলামের কোথাও কী বলা আছে যে আল্লার সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মীদের ধর্মে আঘাত দেওয়াটা তোমার পবিত্র কর্তব্য?

হয়তো আছে। নইলে নিজ ধর্ম পালন করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মে আঘাত করাটাও তারা সমানভাবে পালন করে কেন। ইসলামের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটার পর থেকে দীর্ঘ প্রায় হাজার বছরে ভুরিভুরি এর উদাহরণ দেওয়া যায়। অনেক মুসলিম শাসক জোর করে হিন্দুদের গো-মাংস ভক্ষণ করতে বাধ্য করতেন। মীর নিশার আলি (তিতুমীর) গরু কেটে তার রক্ত মন্দিরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইসলামের জন্ম আরব দেশে, সেখনে গরু প্রায় পাওয়া যায় না বললেই চলে। অথচ ভারতের মুসলমানদের কুরবানী-র মূল জীব হয়ে উঠল গরু। তার একটা বড় কারণ হিন্দুরা গরুকে পূজা করে। তাই গরু কেটে তারা এক ঢিলে দুই পাখি মারল। নিজের ধর্মাচারণ হল আর হিন্দুদের ধর্মে আঘাত করাও হল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই একই অন্যায় হয়ে চলল হিন্দুদের উপর।

সম্প্রতি ইসলামের সেবকরা আর এক উপসর্গ এতে যোগ করেছে। কুরবানীর মাংস মন্দিরে ফেলা। বেশ কয়েকবছর ধরেই এ অন্যায়টা তারা করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গেই গরুর মাংস মন্দিরে ফেলা হয় বেশি। এ রাজ্যের হিন্দুরা রাজনৈতিক জাঁতাকলে পিষে রয়েছে। তাদের শরীর থেকে সমস্ত তেজ বেরিয়ে গেছে। ঢোঁড়াসাপের মতো দু-একবার মাথা তুলবে, ফোঁসফোঁসও করবে, কিন্তু ছোবল মারবে না। আর মারলেও তা নির্বিষ। আর কোথাও হিন্দু জেগে উঠলে রাজনৈতিক নেতারা গিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তাদের শুইয়ে দেবে। তাঁদের কাছে মা-বোনের ইজ্জত, জমি চলে যাওয়া, ধর্মের অপমান সব ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং, আসল হল ভোটব্যাঙ্ক। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার দুটো মন্দিরে গো-মাংস দুষ্কৃতিরা ফেললেও প্রশাসন হিন্দুদের জাগতে দেয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রখার সুমহান দায়িত্ব পালনে তারা সদা জাগ্রত। মুসলমানরা যা করে করুক, কিন্তু হিন্দুরা যেন প্রতিবাদ করার অন্যায়টা না করে। সম্প্রীতি বজায় রাখার চমৎকার পন্থা বের করেছেন এঁরা।

কিছুদিন আগে ফেসবুকে একটি ছবি বেরিয়েছে। মহারাষ্ট্রে এক মুসলিম যুবক শিবলিঙ্গের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহারাষ্ট্রবাসী তাকে ক্ষমা করেনি। দুষ্কৃতিকে খুঁজে বের করে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে মেরেছিল। এই জনরোষকে আটকানো কঠিন। ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরে গো-মাংস ফেলেছে যে সমস্ত দুষ্কৃতি, তাদেরও বিচার হওয়া উচিত। কারণ ধর্মের মধ্যেই একটি জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, সর্বোপরি ব্যক্তিমনের অন্তর্নিহিত চেতনা লুকিয়ে থাকে। তাই ধর্ম বাদ দিয়ে একটি জাতির অস্তিত্বই থাকে না। ধর্মের এই হীন অপমান আমরা মেনে নিচ্ছি কী করে?

এসো বন্ধু, এবার অন্ততঃ রাজনৈতিক পরিচয় আমরা ভুলি। হাতে হাত রেখে শপথ বাক্য পাঠ করি, অনেক হয়েছে, আর এই হয়রানি আমরা সহ্য করবো না। দুষ্কৃতি যেই হোক, তাকে কঠোর সাজা দিতে আমাদের হাত এতটুকুও যেন কেঁপে না যায়। নইলে, স্বয়ং ভগবানই আমাদের মাফ করবেন না। কবির সেই শ্লেষপূর্ণ উক্তি তাই বারবার মনে পড়ছে—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।।'

"যে বাণী একদিন সরস্বতীতীরে ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার প্রতিধ্বনি নগরাজ হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্যের ভিতর দিয়া সমতল প্রদেশে নামিয়া সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছিল, তাহাই আবার উচ্চারিত হইয়াছে। আবার দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে; সকলে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করুন -দ্বার আবার উদঘাটিত হইয়াছে।"

ডাক্তারবাবু

সমীর গুহরায়

অয়ন ডাক্তারের নাম শুনলেই বিন্দি পিসির রাগে গা জ্বলতে থাকে। মুখের ভঙ্গি হয় ঠিক বাংলার পাঁচের মতো। কিন্তু সুজাতারও যে উপায় নেই। ছেলেকে সে একা সামলাতে পারে না। শাশুড়ির পায়ে বাত, হাঁটাচলাই তার দায়। ছোট দেওরও কিছুদিন হল চাকরি পেয়ে চলে গেছে ভুবনেশ্বরে। শ্বশুর নিজের কাজে ব্যস্ত। অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তিনি। অগত্যা বিন্দি পিসি ছাড়া কোন গতি নেই সুজাতার।

যাবে পিসি আমার সঙ্গে।

তোর ওই মিন্‌সে ডাক্তারের কাছে।

তা এখানে আর কাকে দেখাবো বল।

না, এখানে তো আর ডাক্তার নেই। ঐ ঘাটের মরা ডাক্তার দেখি সকলের মাথা খেয়ে রেখেছে। মুখের ভাষা দেখ্, যেন আস্তাকুঁড়।

পিসি, আমরা তো শুধু সোনুকে দেখিয়েই চলে আসব।

আর ডাক্তারের ট্যাক্ ট্যাক্ কথা শুনতে হবে না। আরে বাপু ডাক্তার হয়েছিস্, রুগীর সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার কর। তা না, এমন হাড়পিত্তি জ্বালানো কথা বলবে যে মাথা ঠিক রাখা দায়। তার উপর যখন তখন ইনজেক্‌শন ফুঁড়ে দেবে। নেহাত ডাক্তার মানুষ, না হলে বিন্দি পিসিরও মুখ কম চলে না।

বিন্দি পিসির মুখ যে চলে এটা সুজাতা ভালোই জানে। সুজাতাকে নতুন বৌ হয়ে এসে কম কথা শুনতে হয়নি। স্বামী তার আজ আঠারো বছর নিরুদ্দেশ। অথচ সকালবেলা উঠে স্নান করে সিঁথিতে চওড়া করে তার সিঁদুর দেওয়া চাই। ভাইয়ের সংসারে পড়ে আছেন। শাশুড়ি পারে না বলে ঠাকুরঘরটা তিনি সামলান। ঐটুকুনি সময়ে পিসির মুখে যা লাগাম। তারপর সারাদিন টিক্‌টিক্ করেই চলেছেন ঘড়ির কাঁটার মতো। শাশুড়ির অক্ষমতায় ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের কর্ত্রী হয়ে উঠেছেন পিসি। বাড়িতে কাজের লোক একগাদা। তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে কাজ করানো, কে ফসলের টাকা ঠিক সময়ে দিল না, তাগাদা দিয়ে আদায় করা—একা হাতে সব সামলাচ্ছেন বিন্দি পিসি।

—চল বাপু। আমার আবার ফিরে অনেক কাজ।

সুজাতা রেডি হয়েই ছিল। বলল, বিশুদাকে একটা রিক্সা ডাকতে বলি।

ডাক্তারখানায় বেশি ভিড় ছিল না। দু-একজন রুগী দেখার পর ডাক পড়ল সুজাতার। সোনুকে কোলে করে চেম্বারে ঢুকতেই অয়ন ডাক্তার তাকে শুইয়ে দিতে বলল। ভালো করে পা-দুটোকে পরীক্ষা করলো। তারপর গম্ভীরভাবে নিজের চেয়ারে এসে বসল।

কী বুঝলেন ডাক্তারকাকা।

তোমার ছেলের কেস্‌টা বড় জটিল বৌমা। সোনুর রোগ যতটা শারীরিক তার চেয়ে মানসিক বেশি। ওর পায়ের হাড়, কার্টিলেজ, নার্ভগুলো সব ঠিক আছে। তবু ও হাঁটতে পারছে না, কারণ ও হাঁটতে চাইছে না। একটা ভয় ওর মধ্যে কাজ করছে। অ্যাক্সিডেন্টের পর প্রাথমিকভাবে সোনু উঠে দাঁড়াতে পারেনি। সেটাই ওর মধ্যে কাজ করছে। ও ভাবছে ও আর হাঁটতে পারবে না।

তাহলে ডাক্তারকাকা সোনু কী কোনদিন আর হাঁটতে পারবে না।

পারবে। যেদিন ও নিজে থেকে হাঁটতে চাইবে। কিংবা বাইরে থেকে ফোর্স করে যদি হাঁটানো যায়।

আপনি যদি কিছু একটা করেন—

কিছুক্ষণ ভাবলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, না হেঁটে কিন্তু সোনুর পায়ের নার্ভগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছে। আমি এক্ষুনি ওকে একটা ইন্‌জেকশান দিচ্ছি। নার্ভগুলোকে সক্রিয় রাখবে। আর কাল থেকে বাড়িতে একটা করে রোজ ইন্‌জেকশন দেবে। হরিদাসকে আমি পাঠিয়ে দেবো। রবিবার দুপুরে একবার সোনুকে নিয়ে এস, দেখি কী করতে পারি।

এতক্ষণ বিন্দি পিসি চুপ করে বসে সব শুনছিল। ইন্‌জেকশানের কথা শুনেই শিউরে উঠলেন। ইন্‌জেকশনে খুব ভয়। নিজের কাউকে ছুঁচ ফোটালেও যেন পিসির গায়ে এসে বেঁধে। কিছু একটা তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, সুজাতা তাকে থামিয়ে চুপ করালেন। ছেলে তার, তাই গরজটাও তার।

ইন্‌জেকশন দেওয়ার সময় সোনু একটু চেঁচিয়ে উঠেছিল। বিন্দি পিসির মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। পারলে তিনি অয়ন ডাক্তারকে মেরেই বসেন।

ছেলের যন্ত্রণা কী সুজাতাকে কষ্ট দেয় না। কিন্তু উপায়

কী? ছেলেটাকে যে ভালো করে তুলতেই হবে। কলকাতায় গিয়েও অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছে সোনুকে। বাঙুর নিউরোলজিতেও সাতদিন ভর্তি ছিল। তারাও ঐ একই কথা বলেছেন। সোনুর রোগটা অনেকটাই মানসিক। অয়ন ডাক্তার যা অনেক আগেই বলেছিলেন।

রিক্সায় আসতে আসতে বিন্দি পিসি গজ্‌গজ্‌ করছিলেন। আসলে অয়ন ডাক্তারের মুণ্ডপাত করছিলেন। ছুঁচ ফোটানো ছাড়া এই ডাক্তার আর পারেটা কী?

পিসি, এটা সোনুর ভালোর জন্যই।

হ্যাঁ, ভালোর জন্য। ছেলেটা কেমন কঁকিয়ে উঠল। ইন্‌জেকশনের ছুঁচ দেখলেই আমার বুকটা কেমন ধড়াস ধড়াস করে, আর ও তো কচি বাচ্চা। লাগে না যেন কারো।

সুজাতা কোন উত্তর করে না। জানে বিন্দি পিসির আজ সারাদিনের খোরাক পেয়ে গেছে। কিন্তু কাল থেকে বাড়িতে কীভাবে ইন্‌জেকশন দেওয়া যায় এটাই এখন চিন্তার। হরিদাস কমপাউন্ডারকে পিসি মেরেই না বসে।

আবার ইন্‌জেকশন না দিলেই নয়। অয়ন ডাক্তার এমনিতে ভালো মানুষ। কিন্তু তার কথামতো না চললে, মুখের উপর বলে দেবে, আমি এর চিকিৎসা করতে পারবো না। তোমরা তো সব নিজেরাই ডাক্তার হয়ে গেছ। কিংবা বলবেন আমি তো বুনো ডাক্তার, যাও কোলকাতায় বড় বড় ফিজ্‌ওয়ালা ডাক্তারের কাছে। মজাটা টের পাবে। চিকিৎসার চ-ও হবে না অথচ গ্যাঁটের কড়ি ফাঁকা। এমনি আর কত কী।

ছোট গঞ্জ শহর কমলপুরে আরও বেশ কয়েকজন ডাক্তার আছেন। কিন্তু তারা কেউ ধারে বা ভারে অয়ন ডাক্তারের মতো নন। শ্বশুরমশাই বলেন, রোগ নির্ণয় করাই তো একজন ডাক্তারের সবচেয়ে বড় গুণ। এ ব্যাপারে আমাদের অয়ন ডাক্তারের কাছে কোলকাতার বড় বড় ডাক্তারও ফেল করে যাবে। সত্যি, সুজাতা ভাবে, এতবড় ডাক্তার, তবু কেন যে এইরকম এক মফঃস্বল শহরে পড়ে আছেন।

না, ইনজেকশনগুলো সময়মতো দিতেই হবে। অয়ন ডাক্তারই যে একমাত্র ভরসা। সোনুকে ভালো করে তুলতে হবে। জীবনের সব গেছে, শুধু ছেলেটা—

একটা অ্যাক্সিডেন্ট সুজাতার জীবনের সব সাধআহ্লাদ কেড়ে নিয়ে গেছে। মুহূর্তটা মনে করলেই এখনও আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলে। জয়ন্ত বাইক চালাচ্ছিল। সামনে সোনু আর পিছনে সুজাতা বসে। বড্ড জোরে বাইক চালায় জয়ন্ত। সরু রাস্তা। সুজাতা অনেকবার আস্তে চালাতে বলেছিল, শোনেনি। হঠাৎ-ই পাশের ডোবা থেকে মোষটা রাস্তায় উঠে এসেছিল। কাটাতে গিয়ে আর টাল সামলাতে পারলো না। পাশের জমিতে গড়িয়ে পড়ল বাইক। সোনু ছিট্‌কে বেরিয়ে গিয়েছিল। জয়ন্তর মাথাটা গিয়ে লেগেছিল সামনের ইলেকট্রিক খুঁটিতে। ইন্টারন্যাল হেমারেজ। বাঁচানো যায়নি। সুজাতারও লেগেছিল খুব। শুধু জ্ঞান হারানোর আগে দেখেছিল সোনু কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। তারপর আর কিছু মনে নেই। বিধবার পোষাক পরে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরেছিল সুজাতা। শ্বশুর বলেছিল, বৌমা আমার মেয়ে হয়েই থাকবে। সেও আজ প্রায় দু-বছর হতে চলল।

অ্যাক্সিডেন্টের পর সোনু নিজের পায়ে আর দাঁড়ায়নি। অনেক চিকিৎসা হয়েছে, টাকা খরচ হয়েছে জলের মতো। তবু অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

ভগবানকে ডাকে সুজাতা। ভগবান, ছেলেটার চলার শক্তি ফিরিয়ে দাও। নইলে যে সারাজীবন পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে। দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে সুজাতার। সবতো নিয়েছ, শুধু এটুকু ফিরিয়ে দাও।

বিন্দি পিসি বাড়ি মাথায় করলেও, সুজাতা কিন্তু ঠিক ঠিক ইনজেকশনগুলো দিয়েছিল। ইন্‌জেকশনটাতে বোধহয় লাগে খুব। সোনু কঁকিয়ে ওঠে, ভয় পায়। সেই সময়ে প্রাণপণে ছেলেকে জাপটে ধরে থাকে সুজাতা। বুকের সমস্ত মায়ামমতা দিয়ে ছেলের ব্যথাকে শুষে নিতে চায়।

আজ রবিবার। অয়ন ডাক্তার বলে পাঠিয়েছেন তার চেম্বারে নয়, জেলা হস্‌পিটালে সোনুকে নিয়ে যেতে। সেখানেই তিনি দেখবেন।

বিন্দি পিসি যে রেগে আছে এটা সুজাতা ভালো করেই টের পেয়েছে। তাকে দু-চার কথা শোনাতে ছাড়েনি। নাতিকে ভালোবাসে খুব। হাঁটতে পারেনা বলে হুইল চেয়ারে বাসিয়ে রোজ বিকালে মাঠ থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু সেকালের চিন্তা নিয়ে একালের চিকিৎসা চলে না, পিসিকে বারবার বলেও তা বোঝানো যায়নি।

যাবে পিসি?

কোথায়?

হস্‌পিটালে।

না বাপু, তুমি আর তোমার ডাক্তারের মধ্যে আমি নেই। বিশুকে নিয়ে যাও গে।

বিশুদা তো যাচ্ছে। কিন্তু তুমি না গেলে কী চলবে? আমি যে সোনুকে একা সামলাতে পারি না। কিছুটা অভিমান হয় সুজাতার। ছেলেটা যে আমার। তাই যত হ্যাপা আমাকে সামলাতে হবে।

উপর থেকে জামাকাপড় পড়ে নেমে দেখে বিন্দি পিসি রেডি হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। বিশুদা রিক্সা ডাকতে গেছে।

সুজাতা কাছে আসতেই বলল, দেখো, আজ যদি বেচাল দেখি তাহলে অয়ন ডাক্তারকে দু-চার কথা শুনিয়েই আসবো। বিন্দি কিন্তু সোজা মেয়েমানুষ নয়।

সুজাতা কোন উত্তর করে না। ইতিমধ্যে রিক্সা এসে গেছে। রিক্সায় চড়ে ওরা হাসপাতালের দিকে রওনা দিল। বিশুদা সাইকেলে আসছে।

হাসপাতালে ঢুকতেই হরিদাস কম্পাউন্ডার ওদের দিকে এগিয়ে এল। এই যে, আপনারা এসে গেছেন। স্যার বলেছেন আপনাদের বসাতে। একটা কলে বাইরে গেছেন, এক্ষুণি এসে পড়বেন।

হাসপাতালের বাইরের একটা বেঞ্চে সুজাতা, পিসি আর বিশুদা এসে বসলো। হরিদাস কম্পাউন্ডার দুটো ওয়ার্ড বয়কে কিছু বলতে তারা একটা স্ট্রেচারে করে সোনুকে বড় একটা কাঁচের ঘরে নিয়ে গেল।

অয়ন ডাক্তার এখনও আসেন নি। বেশ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে সময় কাটছে সুজাতার। বিন্দি পিসি বারে বারে উঠে গিয়ে কাঁচের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাইরে থেকে সোনুকে দেখা যাচ্ছে। স্ট্রেচারে শুয়ে আছে। ঘরে আর কোন রুগী নেই। আসলে পুরো হস্পিটালে আজ রোগী খুব কম। রবিবার বলে আউটডোর বন্ধ। অপেক্ষা করতে থাকে সুজাতা।

এমন সময় হস্পিটালের গেটে রিক্সা থেকে নামলেন অয়ন ডাক্তার। সুজাতা উপস্থিতিটুকু জানান দেওয়ার জন্য সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—ও তোমরা এসে গেছ। ছেলে কোথায়?

সোনুকে তো একটা কাঁচের ঘরে নিয়ে গেছে।

ঠিক আছে। তোমরা বাইরে অপেক্ষা করো।

কাঁচের ঘরটার সামনে এসে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ালেন অয়ন ডাক্তার। কিছু যেন ভাবলেন। তারপর আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন। ততক্ষণে সুজাতা, বিন্দিপিসি আর বিশুদা উঠে এসে কাঁচের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছে। শুধু দেখাই যায় না, অনেক ফাঁকফোঁকর, তাই ভিতরের কথা শোনাও যায়।

অয়ন ডাক্তার উত্তেজিত ভাবে সোনুকে কিছু একটা বলছে। প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না। এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এ কি! ডাক্তার তো রীতিমত সোনুকে ধমকাচ্ছে, খুব আজে বাজে কথা বলছে, কখনও চুলের মুঠি ধরে নেড়ে দিচ্ছে, কখনও কানদুটো ধরে মুলে দিচ্ছে। আর সোনু ভয়ে কেমন কুঁকড়ে যাচ্ছে।

একি করছেন ডাক্তারবাবু। পাগল হয়ে গেলেন নাকি? একটা শিশুর সঙ্গে এইরকম দুর্ব্যবহার। এ কি চিকিৎসা না অত্যাচার। বাক্‌রহিত হয়ে পড়ে সুজাতা। বিন্দি পিসির চোখদুটোও বিস্ফারিত। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনিও কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।

আর তখনই ঘটল সেই চরম ঘটনা। অয়ন ডাক্তার সোনুকে তুলে ধরে ধাক্কা দিয়ে স্ট্রেচার থেকে ফেলে দিলেন। উঃ! কি নিদারুণ। সুজাতা আর চোখ চেয়ে যেন দেখতে পারছে না।

পড়ে গিয়ে সোনু যেন কিছু একটা খুঁজছে। মা'কে খুঁজছে। এবার দেখতে পেয়েছে সুজাতাকে। কি আশ্চর্য! সোনু মা মা বলে কোনমতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। উঠে দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত। দু'হাত তুলে মায়ের দিকে এগিয়ে আসছে সোনু। এক-দুই-তিন করে নয়বার পা ফেলে এগিয়ে এসেছে সে তার মায়ের কাছে। তারপর আর টাল সামলাতে পারেনি। পরে গেছে।

বিন্দিপিসি দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। পাষণ্ড, জানোয়ার মুখে যা আসছে তাই বলে অয়ন ডাক্তারকে গালি পাড়ছেন। আর অয়ন ডাক্তার দু-হাত তুলে তাকে কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

সুজাতাও তখন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে এসেছে। এসে দাঁড়িয়েছে ডাক্তারের সামনে। দু'চোখ তার জলে ভরা হলেও মুখে হাসি। ডাক্তারের পা জড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে সুজাতা।

একি বৌমা। একি করছ। ওঠো ওঠো।

ডাক্তারকাকা, আপনার জন্য আজ আমার সোনু নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। নয় পা হেঁটে এগিয়ে এসেছে। আজ দু-বছর পর। এবার সোনু ভালো হয়ে যাবে, না।

হ্যাঁ। ওর ভেতরের জড়তাকে কাটাবার জন্য, ওর উইল ফোর্স জাগাবার জন্য আমাকে আজ রূঢ় হতে হয়েছে। কিন্তু সোনুর জন্য সেটাই ছিল শেষ চিকিৎসা। আমি সফল। সোনু সত্যি এবার ভালো হয়ে যাবে।

তারপর মৃদু হেসে বিন্দি পিসিকে দেখিয়ে সুজাতাকে বলল, আজকের ফিজ্‌টা অবশ্য বিন্দি আমাকে দিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা নিশ্চিন্তে বাড়ি যেতে পারো।

বিন্দি পিসির চোখে জল। বলল, ডাক্তার, এ তোমার কেমন ধারা চিকিৎসা বুঝি না। তবে সত্যিই তুমি নাতিটাকে ভালো করে দিয়েছ। আমি মুখ্যু-সুখ্যু গ্রামের মেয়ে। রাগের বসে দুটো কটুকথা বলে ফেলেছি। আমায় তুমি ক্ষমা করো। তুমি ক্ষমা না করলে আমি কার কাছে চিকিৎসা করাতে আসব বল দিকি?

বিন্দি পিসির কথায় প্রথমে অবাক হলেন অয়ন ডাক্তার। তারপর প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ভরিয়ে তুললেন হস্পিটালের কাঁচের ঘরটা।

অশরীরী

পবিত্র রায়

সন্ধ্যেটা যেন আশ্চর্য রকমের শান্ত। আরও অদ্ভুত হল এই গাঁটার পারিপার্শ্বিক সব কিছুই যেন শান্ত। আবছা একটা অন্ধকার ভাব যেন সর্বত্রই বিরাজ করছে। সূর্য ডুবে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। এতক্ষণ পূর্ণ অন্ধকার হবারই কথা। না, হচ্ছে না। আবছা অন্ধকারটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। শান বাঁধানো ঘাটটায় মহিম একাই বসে আছে। অদ্ভুত একটা প্রশান্তি বিরাজ করছে মহিমের মনে। কি অপূর্ব আজকের সন্ধেটা! যেন সন্ধ্যে পারই হতে চাইছে না, সময় যত এগোচ্ছে রাত হওয়াটা যেন ততই পিছোচ্ছে! পুকুরটা খুব বড় না হলেও বেশ প্রমাণ সাইজের। শান বাঁধানো ঘাটটার দুপার্শ্বে পিঠ-হেলানের জায়গা বানিয়ে বসার বেঞ্চ বানানো আছে। অনেক দিনেরই বানানো ঘাট। মাঝে মাঝে সিমেন্ট খসে গিয়ে তারই প্রমাণ দিচ্ছে। পুকুরটার পশ্চিম পাড়েই ঘাটটি। পূর্ব দিকের পাড়ে বেশ কিছু বড় বড় সাইজের কলাগাছের বাগান আর বেশ কিছু খেজুর গাছ, লম্বা লম্বা সুপারি গাছের সমাহার। আর উত্তর দিকের পাড়ে আছে বে-ঢপ এবং অন্ধকারময় একটা বড় পাকুড় গাছ। দক্ষিণ পাড়টা তুলনায় অনেকটা পরিষ্কার। কিছু খেজুর গাছ - তারপর বেড়া দেওয়া। আর বেড়ার ওপারেই বাড়িতে ঢোকার রাস্তা। ঘাট হতে পরিষ্কার দেখা যায় বেড়ার পরেই রাস্তা এবং তারপরই একটা ছোট মাঠ। মাঠটির পূব দিক দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর গ্রামের মূল রাস্তাটি চলে গেছে। এই রাস্তাটিতে সবসময় লোকজন চলাচল করে। অথচ আজকার দিনে কোন মানুষ চলাচল তো করছেই না—একটা কুকুর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। কোন প্রাণীরই দেখা নেই। এটা গ্রামটির উত্তরপাড়া। আলো কম, অন্ধকারও নেই—একটু বাদেই চাঁদ উঠবার কথা। চাঁদ না উঠলেও দীর্ঘ সুপারি, কলা ও খেজুর গাছের ছায়া পড়েছে পুকুরটায়। উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম—সব দিক থেকেই ছায়া পড়েছে পুকুরটার দিকে। পুকুরের মাঝের অংশটাই যেন একটু বেশি আলোকিত। হাওয়া বলতে বইছেই না। স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলি। যদিও শেষ বসন্তের কাল, তা সত্ত্বেও তেমন গরমও মনে হচ্ছে না। পুকুরটাতেও কি কোন মাছ নেই? এমন কি কোন জলকীটই নেই! না হলে এতটা শান্ত জল হতে পারে কি ভাবে? কোন ঢেউ নেই, একেবারে শান্ত জল। দক্ষিণমুখো হয়ে বসে আছে মহিম। ভাবছে, এত শান্ত পরিবেশ কোনদিন তো সে দেখেনি। আর অবাক হচ্ছে! অথচ জায়গাটি যেন তার বহুদিনের চেনা। আবার কখনো এসেছে বলেও মনে পড়ছে না! ভারী আশ্চর্য! অন্ধকার সামান্য একটু বেড়েছে। মহিম বসে আছে তো আছেই। যাবার মনই হচ্ছে না। আবার মন হলেও উঠতে পারছে না। মহিমের ডান দিকটায় বেশ বড় একটা উঠোন। তার পরই বড়সড় একটা দোতলা টিনের ঘর। বাড়িটাতেও কোনো প্রাণের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। তবে কি বাড়ির সবাই অন্য কোথাও বেড়াতে গেছে? হতে পারে। বাবার মুখে সে শুনেছে পূর্ববঙ্গের বহু বাড়িতেই বাড়ির লোকেরা সপরিবারে বেড়াতে যায় আত্মীয় বাড়িতে। আজ যে গ্রামটায় মহিম এসেছে এইরূপ গ্রামের বর্ণনা সে বাবার মুখেই শুনেছে। এতবড় বাড়ি ফেলে রেখে সবাই বা কেন যাবে! এখানে কি চোর ডাকাতের ভয়ও নেই? এবার মহিমের মনটা যেন কেমন ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল। সাদা শাড়ি পরা কে যেন আসছে না! হ্যাঁ, পুকুরের দক্ষিণপাড়ের রাস্তা ধরে কে যেন বাড়ির দিকেই আসছে। তাহলে এই মানুষটির উপর দায়িত্ব রেখে সবাই বেড়াতে গেছে? মহিম আশ্বস্ত হল। না, বাড়িটা মনুষ্যহীন নয়।

—কে গো বাবা! ওখানে বসে আছ? এই ভর সন্ধ্যেবেলা একা একা বসে কেন? কোন বয়স্ক মহিলার গলার আওয়াজ যেন ভেসে এলো। ডান দিকে তাকিয়ে মহিম দেখতে পেল, একটু আগেই সাদা কাপড় পরা যাকে বাড়ির দিকে আসতে দেখেছিল—খুব সম্ভবতঃ এই মহিলা তিনিই। ইনিও সাদা কাপড় পরিহিতা। মুখটা ভালভাবে দেখা না গেলেও আন্দাজ করা যায় ভদ্রমহিলা নিশ্চিভাবেই সত্তোরোর্ধা। সাদা কাপড় পরার অর্থই হল, ইনি বিধবা। আর সত্তোরোর্ধা মহিলা বিধবা হওয়াতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি মহিম। মহিম ঘোষ। মহিম উত্তর দিল।

—তা বাবা, এই গ্রামে তো মহিম ঘোষ বলে কেউ নেই। তোমার বাড়ি কোথায়? এখানেই বা কেন এসেছ? তোমার

মুখের ভাষা তো এখানকার মত মনে হচ্ছে না? বৃদ্ধা বললেন।

—না-না, ঠাকুমা, আমি এখানকার মানুষ নই। কলকাতায় থাকি। ওপাড়ায় ঘোষদের মহল্লায় আমার পূর্বপুরুষদের বাস ছিল। দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি কাকার বাড়িতে এসেছি। বিকেলবেলা ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম। মহিম উত্তর দিল।

—তোমার বাবার নামটা বলবে?

—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঠাকুরদা-গোপাল চন্দ্র ঘোষ।

—হ্যাঁ মনে পড়েছে। তোমার ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর তোমার বাবা তোমার ঠাকুরমা এবং কাকাকে নিয়ে ইন্ডিয়ায় চলে গিয়েছিল। সে তো প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা! তোমার বাবা আমার চাইতে ১০-১৫ বছরের ছোট ছিল। আমাকে গ্রাম সম্পর্কে কাকীমা বলেই ডাকত। তুমি ঠাকুমা বলে ঠিকই সম্বোধন করেছ।

—তা ঠাকুমা এখন আমি ওপাড়ার দিকে যাই! সন্ধ্যা পার হতে চলল। মহিম বলল।

—না-না তা হয়না। তুমি আজ প্রথম এসেছ—যেতে দেওয়া যায় নাকি? তাছাড়া আমার একটা পৌত্রী আছে। কারও সাথে একটু কথা বলতে পারে না বলে মুখ ভার করে থাকে। কতকাল যে আমরা কারও সাথে কথা বলিনি—বলতে পারিনি! আজ আমার নাতনিটা একটু মন খুলে কথা বলতে পারবে—হয়ত একটু হাসতেও পারবে। না-দাদা তোমার আজ আর যাওয়া হবে না।

—ও ঠাম্মা-তোমার নাতনিকে তো দেখছি না? বেশ আবেগ ভরেই মহিম কথাগুলি বলল। সদ্য যুবা মহিমের পাড়াতুতো ঠাকুমার নাতনি সম্পর্কে কৌতূহল, পুরুষের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

—কোথাও গেছে হয়ত! এক্ষুণিই এসে যাবে। তুমি বাড়ির দিকে চলতো দেখি। ঠাকুমা বলল।

কোন এক অমোঘ টানে মহিম বৃদ্ধার সাথে সাথে বাড়ির বারান্দায় প্রবেশ করল। লম্বা বারান্দা মাটির মেঝে। লম্বা বারান্দার পূর্ব দিকের শেষাংশে একটা তক্তপোষ পাতা আছে। গ্রাম্য জীবনের চলন সই একটা মাদুরও বিছানো আছে। বৃদ্ধা একটা পাতলা কাঁথা বিছিয়ে মহিমকে বসতে বললেন। মহিম যেন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। বৃদ্ধা যেমন বলছে-তেমনই করছে। মহিম তক্তপোষটায় বসার পরিবর্তে গা এলিয়ে দিল। এমনই সময়ে বাইরের দিকে কারও যেন উপস্থিতি মনে হল।

—ও ঠাকুমা, ঠাকুমা? কোন মেয়ে তার ঠাকুমাকে ডাকছে। বোঝা গেল বৃদ্ধার নাতনিটি এসেছে।

—আয়, ভেতরে আয়! দেখ কে এসেছে? ঠাকুমা বলল।

—ওহঃ উনিই তো ঘোষদের পাড়ায় এসেছেন। কলকাতা থেকে এসেছে। আমি তো কালই দেখেছি।

মহিম ভাবছে—আমাকে দেখেছে! আমি তো দেখিনি? তা হবে হয়তো। গ্রাম্য মেয়ে। কখন কোথা থেকে দেখে রেখেছে কে জানে? কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো অন্ধকার নেমে এসেছে, অথচ বাড়িতে কোন আলো জ্বালাচ্ছে না কেউ! ভারী অবাক কাণ্ড দেখতেও কোন অসুবিধা হচ্ছে না!

—ভাবছেন? আলো জ্বালছি না কেন? আমাদের বাড়িতে আলো জ্বালানোর দরকার হয় না। দেখতে কি কোন অসুবিধা হচ্ছে? বৃদ্ধার কিশোরী নাতনিটি মহিমকে বলল।

—না, না। কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

—আজ রাতে আমরা ঘুমোব না। সারারাত গল্প করবো। উহ্, কতদিন যে কথা বলতে পারি না। মন খুলে দু'টো কথা বলতে পারব। কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার!

—এইভাবে সারারাত তুমি আমার সাথে গল্প করে কাটাবে—তোমার ঠাকুরমা কিছু মনে করবে না? তুমি এত সুন্দরী—বয়টাও ১৬/১৭ এর কম হবে না। তায় আমি একজন বিদেশী এবং যুবক—গ্রামের লোকেরাই বা কি মনে করবে?

—কে কি মনে করল, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি এখন আর কিছুই পরোয়া করি না। বর্তমানে আমাকে কারও কিছু করবার ক্ষমতাও নেই। ঠাকুমার কথা বলছেন? এক্ষুণি আহ্নিক করতে গিয়ে মালা জপ শুরু করবে আর চলবে সেই সকাল পর্যন্ত। চৈতন্যালোকে না গিয়ে ছাড়বে না। কিশোরীটি বলল।

কথাগুলিতে মহিমের বেশ ধোঁয়াশ মনে হল। এক গ্রাম্য কিশোরী এমন প্রত্যয় নিয়ে কথা বলছে কেমন করে? দৃঢ়ভাবে কথা বললেও তার মধ্যে সামান্য ঠাট্টা সুলভ ভাবও বর্তমান। সমস্ত কথার সময় ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি যেন লেগেই আছে। কে এই রহস্যময়ী? জানতে ইচ্ছে হলেও মহিম কোনভাবেই জিজ্ঞাসা করতে পারছে না।

—হ্যাঁরে তোরা কথা বল্। আমি আহ্নিক করতে গেলাম। ঠাকুমা বলল।

—হ্যাঁ, যাও। আমি আর মহিমবাবু কথা বলছি। কিশোরীটি বলল।

মহিমবাবু! আমার নাম জানল কি করে! মহিম ভাবছে। গ্রামের কারও কাছ থেকে শুনে থাকবে হয়ত। মহিম আশ্বস্ত হলো। একটা চেয়ারে মহিমের উল্টোদিকে কিশোরীটি বসে আছে। মহিমও উঠে পড়ে পিছনের দিকের খুঁটিতে হেলান দিয়ে কিশোরীটির দিকে মুখ করে বসল।

—আচ্ছা তোমাদের বাড়িতে আর কোন লোকজন নেই? কিশোরীটিকে মহিম জিজ্ঞাসা করল।

—এটা আমাদের বাড়ি নয়। আমাদের বাড়িটা পশ্চিমদিকে ঐ পোড়ামাটির স্তূপটা দেখতে পাচ্ছ না? ঐটাই আমাদের বাড়ি ছিল। সেবার মুসলমানরা এসে আমাদের বাড়ি ঘর সব জ্বালিয়ে দিল। বাবা, মা, দাদাকে খুন করল। বৌদি ছিল খুবই সুন্দরী। বৌদিকে ওরা মারেনি—ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ যে ছোট্ট নদীটা দেখছ না? ওপারেই দেখ একটা পাকা দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এরশাদ সাহেবের বাড়ি। বর্তমানে এরশাদ সাহেবের তৃতীয় ঘরণী হয়ে বসবাস করছে। মাঝেমধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি বৌদির সাথে দেখা করতে যাই। কিছুই বলতে পারি না। বৌদির হৃদয়ের হা-হুতাশ দেখে কিছু বলার সাহসই পাই না। এই বাড়িটা মজুমদারদের। বাড়িতে বন্দুক ছিল। তাই আক্রমণ করতে পারেনি মুসলমানরা। আক্রমণ বন্ধ হলে এরা সবাই ইন্ডিয়ায় চলে গেছে। আমাদের বাবা-দাদা না থাকায় ঘর বাঁধার কেউ ছিল না। কি আর করব? এই ফাঁকা এবং পরিত্যক্ত বাড়িটাতে এসে উঠেছি। বেশ মজবুত বাড়ি। ভালই আছি। আপনাকে আবার তুমি করে বলে ফেললাম। কিছু মনে করেন নি তো?

—না, না। কিছু মনে করিনি। তুমি করেই আমাকে বলবে। তোমার নামটা কিন্তু জানা হলো না। কিশোরীটিকে উদ্দেশ্য করে মহিম বলল।

হঠাৎই কিশোরীটি এক অদ্ভুত রকমের গম্ভীর হয়ে গেল। দু'জনই নিশ্চুপ। কিশোরীটি অধঃবদনে বসে আছে। কি এক অসীম যন্ত্রণায় হাসি খুশি মুখটি যেন পাংশু হয়ে গেছে। মহিম মনে মনে ভাবছে প্রশ্নটাতো অমূলক কিছু নয়! তা সত্ত্বেও প্রশ্নটিতে মেয়েটি দুঃখ পেল কেন? সে যাই হোক প্রশ্নটি না করাই হয়ত ভালো ছিল।

—যদি দুঃখ পেয়ে থাক, তাহলে তোমার নাম জানানোর দরকার নেই। মহিম বলল।

—না না দুঃখ নয়। আসলে আমার নির্দিষ্ট কোন নাম নেই?

—সে কি হয়? কারও নাম থাকে না—সেটা সম্ভব কি? মহিম বলল।

—সেখানেই তো সমস্যা। সবারই নাম থাকে। আমারও আছে। তবে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন সংস্কৃতিতে আমার নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিশোরী বলল।

—এমনও হয় নাকি? একটু খুলেই বল না ব্যাপারটা। মহিম বলল।

—শুনবে আমার কথা? সত্যিই শুনবে? তা হলো শোন; মন দিয়ে শোন।

আমার প্রথম জন্ম হয় আরব দেশে। রসুলুল্লাহর সময়। নাম ছিল রেহানা। কুরাইজা গোত্রের মানুষ ছিলাম। সুন্দরী হিসেবে খ্যাতিও ছিল। নিজ গোত্রের মধ্যে বিয়েও হয়েছিল। খুব শান্তিতেই ছিলাম। হঠাৎই সব যেন উলটপালট হয়ে গেল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কিশোরীটি যেন উদাস হয়ে পড়ল।

রসুলুল্লাহ আমাদের গোত্রকে অবরোধ করলেন। আমরা বাঁচার জন্য পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। পাহাড়ে উঠে আমাদের আক্রমণ করা সহজ নয় দেখে রসুলুল্লাহ আমাদের অভয় দিলেন যে আমরা নেমে এলে আমাদের কোন ক্ষতি করা হবে না। রসুলুল্লাহর কথায় ভরসা করে আমরা নেমে এলাম। আমাদের বন্দী করা হল। কিছুদিন পূর্বেও আমাদের গোত্রে থাকা সাদে'র ওপর আমাদের বিচারভার দেওয়া হল। বিচারে আমাদের যত যুদ্ধক্ষম মানুষ আছে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছে সবাইকে হত্যার আদেশ দেওয়া হল। বাদ কেউই গেল না। আগের দিন আমাদের দ্বারাই মক্কার উপকণ্ঠে বেশ বড় রকমের গর্ত খোঁড়ানো হল। পরদিন সকাল হতে একে একে আমাদের আটশত জনকে খুন করে সেই গর্তের মধ্যে পুঁতে দেওয়া হল। আমার বাবা-মা, স্বামী সবাইকেই আমার সামনে কোতল করা হল। আর তারপর? সেই রাত্রেই আমার শরীরটার উপর ভোগ নিমিত্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল নবীজি। না, সারাজীবন চরম নির্যাতনের মধ্যে থেকেও ধর্ম পরিবর্তন করিনি। সেই জনমটা আমার কেটেছিল যৌনদাসী হয়ে। হাঁফ ছেড়েছিলাম নবীজির মৃত্যুর পর। দেখবে, নবীজির মৃত্যুর পর আমার কি হয়েছিল, সে খবরই বা ক'জন রাখে?

নবীজির মৃত্যুর পর তার মতবাদে আকৃষ্ট সমস্ত মানুষ আরব উপদ্বীপ এলাকা হতে একটার পর একটা বাইরের দেশ আক্রমণ করতে থাকল—আর বার বার বিজয়ী হয়ে বিজিতদের কুরাইজা করণ করতে থাকল—কেউ কিন্তু ইসলামকে বিচার করল না।

এরপরই আমার জন্ম হল ভারতবর্ষে। সেই জন্মে আমি কে ছিলাম—কোথায় জন্মেছিলাম? সিন্ধু অঞ্চলের রাজা ছিলেন চাচ। চাচ-এর পুত্র দাহির আমাকে বিয়ে করেন। সেও রাজা হয়েছিলেন। আমার নাম ছিল রাণীবাঈ। বিন কাশিম যখন বৌদ্ধদের বিশ্বাসঘাতকতায় দাহিরকে পরাজিত ও হত্যা করল—সে খবর বাড়িতে বসেই আমরা পেলাম। দাহিরেরও কিছু ভুল ছিল। ভাগ্যও সহায় ছিল না। যেমন দাহিরের সেনাবাহিনীতে পাঁচশোর মত মুসলমান সৈন্য ছিল। চরম মুহূর্তে তারা বেইমানী করে, ও বলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। উল্টে বিন কাশিম এর দলে যোগ দেয় এবং সমস্ত গোপন খবর বিন কাশিমকে বলে দেয়। অবশ্য এ ব্যাপারে মুসলমান সৈন্যদের দোষ দেওয়া যায় না। এইরূপ কাজ ওদের মজ্জাগত। রাজা হরি সিং-এর সেনাবাহিনীতেও মুসলমান

সৈন্যরা তো এইরূপই করেছিল। সে যা হোক, মুসলমান সৈন্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করার সাথে সাথেই দাহির ভেঙে পড়ল না। প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করে কাশিমের বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ফেলল। এমন সময় দাহিরের বাহন হাতিটি পিপাসার্ত হওয়ায় জলপান করার জন্য রাজাকে অমান্য করে চলে যায় এবং বেশ কয়েকজন মুসলমান দাহিরকে ঘিরে ফেলে এবং হত্যা করে। দাহিরের সবচাইতে বড় ভুল হয়েছিল যুদ্ধগমনের আগে পরবর্তী সেনাপ্রধান ঠিক না করা। ফলে দাহিরের মৃত্যু হলে সেনাবাহিনী নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে এবং পরাজয় বরণ করে।

মুসলমান বাহিনী সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছিলাম, এরা প্রচণ্ড নারীমাংশ লোলুপ। প্রাসাদের সমস্ত মেয়েরা মিলে বিষপান করে আত্মহত্যা করব স্থির করলাম। প্রাসাদের একজন রক্ষী এসে জানাল—ওরা মৃতদেহকেও রেয়াত করে না, ধর্ষণ করে। তখন প্রাসাদের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বালালাম। শিশুদেরকে মা হয়েও আগুনের মধ্যে আমরা ছুঁড়ে মারতে থাকলাম এবং তারপর নিজেরা ঝাঁপ দিলাম। ঐ ঘটনাটিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম 'জহর ব্রত' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

—মুসলমানরা মৃতদেহ সম্ভোগ করে—একথা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মহিম বলল।

—তোমার মত বৈষ্ণব আচারের হিন্দুর পক্ষে এটাই সঠিক মনোবৃত্তি। চিন্তা করো না। প্রমাণ দেব।

—তারপর কি হল?

—তারপর? আরে বল্‌চি, বলছি। একটু ধৈর্য্য ধরো না।

সেই সাতশো বারোর বিন কাশিমীয় ঘটনার পর আমার ও দাহিরের দুইটি অপূর্ব সুন্দরী কন্যা জীবিত ছিল। বিন কাশিম ওদের বন্দী করে হাজ্জাজ-এর নিকট ভোগ করার জন্য উপহার হিসেবে পাঠায়। প্রসঙ্গত হাজ্জাজ ছিল মুসলমান খলিফার পূর্বাঞ্চলের গভর্ণর এবং বিন কাশিমের শ্বশুরমশাই। ভাবতে পারো, জামাই শ্বশুর মশাইকে নারী প্রেরণ করছে ভোগের নিমিত্ত? আমি দেহান্তরিত হয়ে আমারই দুই কন্যার কায়াতে উপনীত হলাম। দুই কায়াও শেষ হল—বা হাজ্জাজ চরম নির্যাতন করে মেরে ফেলল। পুনরায় কায়াহীন হলাম—নতুন কায়ার সন্ধান করতে থাকলাম। অবশ্য এর পরের ঘটনাটি একটু অন্যরকম।

—যেমন?

—যেমন? বিন কাশিম-এর ভারত আক্রমণের পর নতুন কায়া ধারণ করার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১১৭২ সালের পর অবশ্য কায়াধারণ অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়েছিল। মুসলমান শাসন জাঁকিয়ে বসে ভারতের বুকে। পাড়ায়-পাড়ায় মহল্লায়-মহল্লায় মুসলমানদের অত্যাচার এবং হত্যাকরণ এমন ব্যাপকতা লাভ করল যে মুহূর্তে মুহূর্তে অমার আত্মা 'কায়া' পাল্টাতে থাকল। হিন্দুরা বৈদিক ক্রিয়াকর্ম রাতে করা শুরু করল। ওরা সুন্দরী নারী পেলে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে থাকল। আশ্চর্য ব্যাপার কি জান? তখনও হিন্দুরা জনসংখ্যায় অনেক বেশি থাকা সত্ত্বেও এক হয়ে প্রতিরোধ করল না। শুধুই জাতপাত নিয়ে পড়ে রইল।

ঠিক এমনি এক সময়ে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হল। জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদের নামে বৌদ্ধধর্মের কঙ্কাল-এর উপর নতুন নামে বৈষ্ণব মতবাদের জন্ম দিলেন। জাতের নামে বজ্জাতি শুরু হল। বৈষ্ণব ছাড়া অন্যরা সবাই হীন বলা হতে থাকলো। নতুনরূপে জাতিভেদ প্রথা আগমন করল। জাতিকে নির্বীর্যকরণ শুরু হলো—যার কুফল ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুগণ আজও বহন করে চলেছে।

—তুমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকেও সমালোচনা করছ!

—রাখতো তোমার গৌরাঙ্গকে। আমার বাবা-মা-দাদা সবার গলাতেই তুলসীর মালা ছিল। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় চৈতন্যর কথামত মালা জপ করতেন উদ্ধার হওয়ার জন্য। পরিণাম ফল হয়েছে ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে মেষ শাবকদের মত অবস্থা। মুসলমান আক্রমণের সামনে কোন বাধা হতেই পারল না। ভোজালির কোপ খেয়ে ধড়-মাথা, বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা করে মরল। অবশ্য একদিকে চৈতন্যর কথা সঠিক হয়েছে। আমার বাবা-মা ও দাদা মুসলমানদের কোপের ফলে উদ্ধার হয়েছে। একরাশ তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল মেয়েটির অভিব্যক্তিতে।

খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর মেয়েটি আবার বলা শুরু করল। নদীর ওপারে ঐ যে গ্রামটা, যেখানে আমার বৌদি থাকে গ্রামটা খুবই বড় এবং সম্পূর্ণ মুসলমান গ্রাম। আর ঠিক পাশেই একটা ছোট্ট গ্রাম। মুসলমান গ্রামটির অর্ধেক হবে বোধহয়। জান! মুসলমানদের পাশের গ্রাম হলেও ঐ গ্রামে কখনো হামলা হয়নি। ঐ গ্রামটায় আমাদের গ্রামের মত উঁচু বর্ণের বাস নয়। কিছু 'পোদ' আর 'নমঃশূদ্র'র বসবাস। একবার গিয়েছিল গ্রামটায় হামলা করার জন্য। 'পোদ' আর 'নম'রা একজোটে এমনভাবে আক্রমণ প্রতিহত করল যে ২৩ জন মুসলমানকে খুন করে ফেলল। অবশ্য ২ জন নমঃও খুন হয়েছিল। রাতারাতি সমস্ত লাশ গায়েব করে ফেলল। পরদিন এমন ভাব দেখাতে থাকল যেন কিছুই হয় নি।

১৮৭১ সালে ভারতে প্রথম জনগণনা হয়। বাংলার জনগণনার আধিকারিক ছিলেন মিঃ হান্টার নামক জনৈক ইংরেজ। তিনি এই 'নমঃ' জাতিকে যোদ্ধাজাতি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। এদের ঘরে ঢাল, সড়কি, রামদা উন্মুক্ত ভাবেই ঝোলানো থাকত।

আর 'পোদ' জাতি আসলে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। বাংলাদেশে রাজপুত ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য কোনদিনই ছিল না। এই সহিংস ব্রাত্য ক্ষত্রিয়রা বারে বারে অস্ত্র ধারণ করে বাংলাদেশে উঁচুবর্ণকে রক্ষা—হিন্দু ধর্মকে বাঁচিয়েছে। উঁচু বর্ণের মানুষেরা হিন্দুধর্মের এই যোদ্ধা শাখা দুটিকে নিম্নতর এবং ছোটজাত বলে আলাদা করে রেখেছে। চৈতন্য এসে শুধুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ করে গেল। রায় রামানন্দ যথেষ্ট প্রভাবশালী হওয়ার পরও নীচু জাতের কারণে তার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করলেন না। আমাদের গ্রামের দক্ষিণ দিকটা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার কারণও হল ঐ 'নমঃ' এবং 'পোদ'রা। ওরা সশস্ত্র হয়ে এসে প্রতিরোধ করলে মুসলমানরা পালাতে শুরু করে। ওদের গ্রামের কোন মেয়ে-বৌ এর দিকে মুসলমানরা চোখ তুলেও তাকাতে সাহস পায় না। ওরা বলে ওদের কোন মেয়ের উপর যতটুকু অত্যাচার হবে তার দশগুণ অত্যাচার করা হবে মুসলমানদের দশটি মেয়ের উপর।

এই পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশে আমাদের উপর যেরকম অত্যাচার হয়, তার কোন খোঁজই কি তোমার রাখ না? যদি কোন খোঁজই রেখে থাক, তাহলে কোনদিন একটু পদযাত্রাও তো তোমরা করতে পারতে! হিন্দু হত্যাকারী দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর সপক্ষে মিছিল করতে দাও—আর হিন্দু অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করতে দাও না। বড় বিচিত্র জীব তোমরা। পাকিস্তান থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সব ছেড়ে ছুড়ে ইন্ডিয়াতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ সেজে পড়লে। একটু সঙ্গতি অর্জন করার সাথে সাথে এপার বাংলার হিন্দুদেরকে ঘৃণাভরে 'বাঙাল' বলে গঞ্জনা করতে থাক। অথচ যারা তোমাদের দেশান্তরিত করেছে—মা-বোনদের ধর্ষণ করেছে, সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে তারা কখনো বেড়াতে গেলে প্রেমে বিগলিত হয়ে পড়। গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাক—আর ওরা মনে মনে হাসতে থাকে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে—আপন সত্ত্বা বজায় রাখতে হলে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয়। আত্মরক্ষা করা শিখতে হয়—আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হত্যাও শিখতে হয়, যেটা তোমার একেবারেই জান না। খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর মেয়েটি পুনরায় বলতে শুরু করল। জানতো তোমরা ভারতীয়রা আমাদের বড় ভাই! তোমাদের দিকে চেয়ে থাকি অভাগা আমরা। আর তাই তো আমরা ধর্মান্তরিত হই না। তোমরা কি আমাদের জন্য একটুও কিছু করতে পার না? যদিও তোমরা করতে পার—তাও তোমরা কর না। পশ্চিমবঙ্গে গমন করে ধর্মনিরপেক্ষ সেজে হিন্দুর মধ্যেই 'ঘটি-বাঙাল' বানিয়ে লড়াই শুরু করলে। মনে রাখা দরকার ঘটি এবং বাঙাল দু'পক্ষই কিন্তু সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের তোষণকারী হয়ে উঠল। আজ মুসলমানরা বলতে শুরু করেছে পাকিস্তান থেকে এসে বাঙালরা দেশটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুগণ কিন্তু বলতে পারছে না, "বেয়াদব সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী মুসলমানগণ পাকিস্তান নেবার পরও এখানে আছে কেন? বাংলাদেশ থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরাই দেশকে উচ্ছন্নে নিয়ে যাচ্ছে—আর তাতে সহায়তা করছে এখানকার মুসলিমরা।"

—তুমি এত ভাল পশ্চিমবঙ্গীয় টানে বাংলা বলছ কেমন করে? মহিম জিজ্ঞাসা করল।

একটু হেসে মেয়েটি বলল, "ওহ, এই কথা? আমি আমার ইচ্ছামত ভারতে যাই—থাকি। আবার যখন ঠাকমার কথা মনে পড়ে তখন চলে আসি। এই করে করে আমি তোমাদের ভাষা শিখে নিয়েছি।"

—সে তো বুঝলাম। তুমি কিন্তু তোমার নাম পরিচয় এখনো আমাকে জানালে না।

—আরে বলছি তো! একটু ধৈর্য্য ধরে শোন না। যতরকম অত্যাচার আমার উপর হয় হোক। কোন কালেই আমি ধর্ম পরিবর্তন করিনি—করবোও না। হ্যাঁ, আমি সর্বংসহা হয়ে হিন্দুধর্ম ধারণ করে রাখব। শক্তিরূপিণী হয়ে বেঁচে থাকব। কথাগুলি বলবার সময়ে মেয়েটির চোখে মুখে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। মহিম ভয়ঙ্কর সুন্দর সেই চেহারার দিকে তাকিয়ে যেন বাকরহিত হয়ে পড়ল।

—তুমি এত সুন্দরী! অথচ যুগে যুগে কতই না নির্যাতিত হয়েছো! মহিম বলল।

—প্রেম নিবেদন করছ? এই ন্যাকা ন্যাকা প্রেম নিবেদন আমার একেবারেই ভাল লাগে না। আমি হিন্দু নারী। আমার স্বাধীনতা আছে মনের মত সঙ্গী জোগাড় করার। প্রয়োজনে প্রেম নিবেদন করব আমি—আমার মনের মত 'বীর' মানবকে। রুক্মিণী যেমন শ্রীকৃষ্ণকে করেছিলেন, হিড়িম্বা যেমন ভীমকে, শূর্পনখা লক্ষ্মণকে। পৌরাণিক যুগের স্বয়ম্বর সভা তো নারী শক্তির স্বাধীনতারই পরিচায়ক! মেয়ে দেখলেই প্রেম নিবেদন করা মুসলমানদের স্বভাব। আমি এই ন্যাকা প্রেম নিবেদনকারীকে ঘৃণা করি। হিন্দুধর্ম রক্ষার্থে বীরসূচক ভাবে কি করেছো? কটা হিন্দুর শত্রুকে ধ্বংস করেছো? কটা হিন্দুকে বাঁচিয়েছ? ক'টা হিন্দুনারীর সম্ভ্রম রক্ষা করেছো? আগে এই কাজগুলির প্রমাণ উপস্থাপনা করে এসো। দেখবে আমিই তোমায় প্রেম নিবেদন করছি। বীরভোগ্যা ধরিত্রী। সর্বংসহা ধরিত্রী যদি বীরভোগ্যাই হয়ে থাকে, নারীও সর্বংসহা এবং সেই অর্থে বীরভোগ্যাই হতে চায়।

—সেটাই বা কিভাবে সম্ভব? মহিম জিজ্ঞাসা করল।

—তুমি একটা ঢেঁড়স। কলেজে পড়বার সময় তোমার সহপাঠিনী 'মৌ' কে রসিদ তুলে নিতে এসেছিল, তখন পালিয়েছিল

কেন? 'মৌ' তো তোমাকেই ভালবাসত। অশিক্ষিত গো-মুর্খ সুরেন নস্করের বড় ছেলেটা সংবাদ শোনামাত্র রসিদের দুই বোন ও মা'কে উঠিয়ে এনে পণবন্দী করেছিল। 'মৌ' উদ্ধার হয়েছিল। প্রদীপ নস্কর কিন্তু রসিদকে ছাড়েনি, ট্রাম লাইনের পাথর দিয়ে মাথাটা চূর্ণ করে দিয়েছিল। প্রমাণ করা যায়নি রসিদ হিসেবে! প্রদীপের নাম শুনলেই মুসলমানরা এখন পালায়—যেমন পালাত গোপাল পাঁঠার নাম শুনে। কিছুকাল আগে দেগঙ্গায় হিন্দু-দোকান জ্বালিয়ে দিল, ক্যানিং-এর তিনটি হিন্দুগ্রাম মুসলমানরা জ্বালিয়ে দিল—তুমি প্রতিরোধে কোন ভূমিকা নিয়েছিলে? মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যখন মুসলমানরা আচার পালনে বাধা দেয় তখন কোথায় লুকোয় তোমার পৌরুষ?

—আমাদের দেশ সম্পর্কে তুমি তো বেশ ভালরকম খোঁজ খবরই রাখ দেখছি।

—ভোলাবার চেষ্টা করো না। হিন্দু বলে গর্ব করো—ধর্মটা বাঁচানোর কর্তব্য করবে কে, সেটা ভেবেছ কি? জান, মুসলমানরা ধর্ষণ করে কেন? কারণ হলো চোখের সামনে ধর্ষণ করার ফলে হিন্দুদের মনোবল ভেঙে যায়। আর মনোবল ভাঙার ফলে অস্ত্রধারণের পরিবর্তে দেবতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলমানদের কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। কাজটা তোমার উল্টো শুরু করতে পারো। ওদের মনোবল ভেঙে যাবে। ওরা মহিলাদিগকে জমি মনে করে। তোমার জমি দখল শুরু করো। সিরিয়ায় আই এস খৃষ্টান, ইয়েজিদি আর কুর্দদের জমি দখল শুরু করায় ওদের মনোবল ভেঙে গেছে—শরণার্থী হয়ে ইউরোপ পাড়ি দিচ্ছে। মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের জমি অহিংস বৌদ্ধরা দখল করছে---রোহিঙ্গাদেরও মনোবল ভেঙে গেছে—তারাও শরণার্থী হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে শুধুই মুসলমান দ্বারা অমুসলিম উদ্বাস্তুকরণ চলেছে। বর্তমানে মুসলিম উদ্বাস্তুকরণ শুরু হয়েছে। এই সময় তোমরা হিন্দুরাই শুধুমাত্র পিছিয়ে আছো। পাকিস্তান তোমাদের হুমকি দিচ্ছে—তাতেও তোমাদের হেলদোল নেই। হিন্দু হিন্দু করে তোমরা বড্ড বড়াই করে থাক। আসলে কি বড়াই করার মত? বাঙালী হিন্দুর মধ্যে বানিয়েছ ঘটি-বাঙাল। তার উপর ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈশ্য এবং শূদ্র। এই চার বর্ণের মধ্যেও বহু উঁচু-নীচু ভাগ। অদিবাসীদেরকে তো ভিনগ্রহ থেকে আসা কোন জীবন মনে করো! হিন্দিভাষী হিন্দুদিগকে তো এককথায় হিন্দুস্তানী বলে চালিয়ে দাও—যেন ওরা হিন্দু নয়। মুসলমানদের মধ্যে কিন্তু এইরূপ নয়। সারা পৃথিবীর মুসলমান ভাই-ভাই। ধর্মকে বাঁচাতে হলে আগে তোমাদের বিভেদটা দূর করতে হবে।

—সেতো ভাল কথা। তোমাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। কি যেন বলছিলে? ১১৭২ এর পর থেকে বারে বারে 'কায়া' পরিবর্তন করেছ না কি যেন! মহিম বলল।

—হ্যাঁ, বার বার কায়া পরিবর্তন করতাম—আর নতুন কায়া ধারণ করতাম। হঠাৎ একবার মনে হল খৃষ্টান হয়ে দেখলে কেমন হয়? যে কথা সেই কাজ। ১৯৪৭-এ ঢুকে পড়লাম খৃষ্টান পরিবারের এক সুন্দরী মেয়ের শরীরে। এক উপজাতি পরিবার ছিল আমাদের। দেশবিভাগ কাল ও তৎপরবর্তী সময়ে মুসলমান কর্তৃক হিন্দু অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে বহু আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে। উত্তর পূর্ব বাংলাদেশের চাকমা-গারো প্রভৃতি উপজাতিদের উপর কি পরিমাণ অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে—সে সম্পর্কে কোন খোঁজখবর যেন সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিক বা সংগঠন, রাখার প্রয়োজন মনে করেনি। উহঃ কি নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল, ভাবতে গেলে এখনো শিউরে উঠতে হয়।

—পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুদের চাইতেও খারাপ অবস্থা ছিল না কি?

কথাটা না শোনার ভান করে কিশোরীটি সোজাসুজি মহিমকে প্রশ্ন করে বসল।

—কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছ, সেটা আমি জানি। দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়েছো সেটাও আমি জানি। অসমীয়া লেখক উমাকান্ত শর্মার লেখা 'মি ছাঙর দুটা পার' নামক উপন্যাসটি পড়েছো? অমি সেই উপন্যাস-এর নায়িকা চিত্রামণি।

—আমি অসমীয়া জানি না।

---একপ্রকার হুবহু ভাষান্তরিত হয়েছে। মানস রায় ভাষান্তরিত করে নাম দিয়েছেন 'সিম সাঙের দুটি পার'। আসলে কথা হল গারো পাহাড়ে 'সিমছাং' নদীটি ময়মনসিংহতে 'ধলেশ্বরী'। এই ধলেশ্বরীর দুটো পারের উপর লেখা পারের উপর লেখা হয়েছে উপন্যাসটি। পারলে পড়ে নিও। সব জন্মের সব কথা যদি বলতে হয় রাতের মধ্যে শেষ হবে না। শুধু একটা কথা বলে রাখছি। কথাটা হল দেশভাগের আগে শাসক ছিল ইংরেজ খৃষ্টানগণ। আমরা ভারতীয় তথা উপজাতীয় খৃষ্টান হওয়ায় আমাদের স্বার্থরক্ষার বা প্রাণরক্ষার কোন প্রয়োজন ওরা বোধ করেনি। সারা পৃথিবীর খৃষ্টান সম্প্রদায়ও আমাদের ব্যাপারে উদাসীন ছিল—এখনো আছে। বরং এই হিন্দুরাই নিপীড়িত খৃষ্টানদের আশ্রয় দিয়েছিল ভারতের মাটিতে। ভীরু এবং কাপুরুষ হলেও মানবতায় হিন্দুরা অনেক বেশি এগিয়ে আছে।

—তারপর? মহিম জিজ্ঞাসা করল।

—তারপর এলো আবার কায়া পরিবর্তন কাল। এবার হলাম হিন্দু পরিবারের মেয়ে। সালাম আজাদের লেখা পড়েছ?

আমাদের বগলের-উরুর গন্ধে নাকি কোন এক জানোয়ার মাতাল হয়ে ওঠে। সে যাইহোক এবার এলাম এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। চক্রবর্তী পদবীধারী পরিবার। নীলিমা ইব্রাহিমের লেখায় আমার পরিচয় পাবে। মুসলমানদের যৌনক্ষুধা মেটাতে মেটাতে আমি হয়ে গেলাম ঢাকা শহরের নামী এক বেশ্যা।

অবশ্য এর আগে একবার শেফালি ঘরামি হয়ে জন্মেছিলাম। জানোয়ার দেলোয়ার হোসেনটা মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে আমাদের হোগলবুনিয়া গ্রামের হিন্দুপাড়ায় রাজাকার বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়ে। সবাই পালাতে পারলেও আমি পালাতে পারিনি। মধুসূদন ঘরামি ছিল আমার স্বামী। সে পালাতে পেরেছিল। না পারলে হয়ত গুলি করেই মারত। সাইদি অর্থাৎ দেলোয়ার হোসেন ও তার সহযোগীরা আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে অর্ধবাহ্য দশায় ফেলে রেখে যায়।

—তুমি তোমার নাম ধাম জানাচ্ছ না কেন?

—তবে কি এতক্ষণ করে তোমার পরিচয় জানাচ্ছি? শিক্ষিত মানুষ বলে পরিচয় দিয়ে থাক—কথা বোঝ না। এতক্ষণ যেটা বললাম সে তো আমারই পরিচয়।

—সব ঠিক আছে। কিন্তু পরিচয়টা পরিষ্কার হল না।

—সবই পরিষ্কার হবে। একটু ধৈর্য্য ধরো। শুনতে থাকো।

মালবিকার কথা মনে পড়ে? মালবিকা হালদার। বয়স ১৬ বৎসর। ২০১৪ সালে নবম শ্রেণীতে পড়ত। ২০০৮ সালে নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুসের আমন্ত্রণে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী যখন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন—তখন মানিকগঞ্জের নীলটেক গ্রামে গিয়েছিলেন ক্ষুদ্র ঋণে স্বাবলম্বী হবার নিদর্শন দেখতে। সেদিন ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে মালবিকা মানিকগঞ্জবাসীর পক্ষ থেকে প্রথম মালা পরিয়ে রাহুল গান্ধীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। সেই মালাবিকা আর নেই। ২৫শে জুলাই, ২০১৫ তে যখন তার বাবা-মা বাড়িতে ছিল না, তখন প্রতিবেশী আব্দুর রাজ্জাক ধর্ষণ করে, খুন করেছে। তোমরা কি সে খোঁজ রেখেছো? তোমরা তো মানবতার পূজারী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের গলাবাজধারী, মানবাধিকার এর রক্ষাকর্তা—মালবিকার মানবাধিকার সম্পর্কে নীরব কেন? বীরভূমের সান্তোরে একজন মুসলমান মহিলা সামান্য একটু লাঞ্ছিত হয়েছে—তাতেই গেল গেল রব উঠেছে। মালবিকা হিন্দু বলে কি মানবাধিকার পাওয়ার যোগ্য ছিল না? ধর্ষক আব্দুর রাজ্জাক বুক ফুলিয়ে মালবিকার বাবা-মায়ের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে, আর তোমরা ভেড়ার পালের মত মুসলমান তোষণের দিকে দৌড়ে যাচ্ছ—লজ্জা করে না? কেন এসেছো আমাদের দেশে? এসেছো এবং শুনতে যখন চেয়েছো, আমাদের রাগ, দুঃখ, মান-অভিমান, সমস্ত কিছুই তোমাকে শুনতে হবে।

মহিম অধোঃবদনে বসে আছে। মেয়েটির মুখের দিকেও তাকাতে পারছে না। কোন উত্তরও মুখে জোগাচ্ছে না। আর কি ই বা উত্তর দেওয়া যায়!

পূর্ণিমা শীলকে চেনো? আস্তে আস্তে মেয়েটি বলল। পূর্ণিমা শীলের জন্য কিছুটা হলেও ভালই। মৃত্যুটা ওকে ছেড়ে দিয়ে গেছে। তারপর আরও প্রাপ্তি হল শাহরিয়ার কবীর, মুনতাসীর মামুদের স্নেহময় হাতের ছায়া তার উপর পড়েছে। মানুষ জানতে পেরেছে। তা সত্ত্বেও মেয়েটার সারাজীবন যে আত্মগ্লানি বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে—সেই ক্ষতিপূরণ দেবে কে? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ল।

—আমাদের দেশে হলে ওদের খুন করতাম। মহিম বলল।

—চোপ! কাপুরুষ কোথাকার!

—এভাবে বলছ কেন?

—বলব না? কামদুনির শিপ্রা ঘোষের নাম শুনেছ। আমার কাছে মাঝেমধ্যে মেয়েটা আসে। প্রথমে পশুগুলো মেয়েটাকে ছিঁড়ে খেল তারপর পা দুটো ধরে টেনে চিরে দিল। ঠিক যেন ১৯৭১-এর পূর্ব পাকিস্তান। শিশুদের স্বাভাবিকত; মাথা ঠুকে না হয় ছিঁড়ে ফেলে হত্যা করত মুসলমানরা। কি করেছিলে বীরপুঙ্গবেরা শিপ্রাঘোষের পরিণতি নিয়ে? যদি নিতান্তপক্ষে পশুগুলোর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে পারতে—তাও না হয় বলার কিছু থাকত। বরং উত্তরপ্রদেশে মুজফ্ফরনগরে বোনের সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে হিন্দুরা মার খাওয়ার পর চরম ঠাণ্ডার সময় মুসলমানদের এমন শিক্ষা দিয়েছে যে বহুদিন যাবৎ আর মাথা উঁচু করার সাহস দেখাবে না। আর যদি মেনেও নিই যে তুমি তোমার দেশে হলে ওদের খুন করতে—তাতেই কি সমস্যার সুরাহা হতো? মনে রাখবে ইসলামে ধর্ষণ বলে কিছু হয় না—জোর করে যৌন সম্পর্ক করা কোন পাপ নয়। হ্যাঁ, মুসলমান মেয়েরাও সেটা স্বীকার করেন—মেনে নেয়। না হলে এতদিন মুসলমান ছেলেদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না কেন? আই এস এলাকার বসবাসকারী এক সুন্নী মহিলা 'দাবিক' নামক পত্রিকায় লিখেছে "জোর করে যৌন সম্পর্ক স্থাপন কখনোই ধর্ষণ নয়।" সুতরাং ইসলামী মতে ধর্ষণ বলে কোন শব্দের অস্তিত্ব স্বীকার হয় না।

—ঐ মহিলাটির নাম কি?

—সুমাইয়া। মেয়েটি উত্তর দিল।

—ঐ জানোয়ার মেয়েছেলেটা এইরূপ বলেছে?

—আসল কথা হল তুমি একটা ধম্মের ষাঁড়। কিছু বোঝ না। ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছো? না, করোনি। ইসলামী দর্শনের বাইরে কথা বলার মত ক্ষমতা কোন মুসলমান

নারী-পুরুষের নেই। মধ্যযুগীয় দাসব্যবসা-নারী ব্যবসা, মারামারি করে নারীদেহের মালিক হওয়ার বহু উদাহরণ ইসলামী দর্শনে বর্তমান। সেই দর্শনটাই ওরা আঁকড়ে ধরে আছে। একটু আগেই তুমি বলছিলে, 'খুন করতে।' এক আধটা খুন করে পঙ্গপাল শেষ করা যায় কি? বাঘের মন থেকে জঙ্গল ওঠানোর মত কাজ করা সম্ভব কি? না, সম্ভব নয়। তাহলে একমাত্র উপায় হল 'নাশকরণ'। সবচাইতে ভাল হয় শ্রীকৃষ্ণের কথা মেনে বিশেষরূপে নাশ বা বিনাশ করণ। অবশ্য বিনাশ করতে গেলে বর্তমান অবস্থায় তোমরাই বিনাশ হয়ে যাবে।

—কেন? মহিম বলল।

—বলতো মধ্যযুগে ইসলামের অভ্যুদয় হবার পর এত অল্প সময়ে সারা পৃথিবীর দিকে ঝড়ের গতিতে বেড়ে গেল কেমন ভাবে?

—জানি না। মহিম উত্তর দিল।

—কারণ ছিল ইসলামী দর্শন বা নীতি অন্যরা কেউ জানার চেষ্টা করেনি বা জানতে পারেনি। যদি ইসলামী দর্শন জানতে পারত অন্যান্যরা, তাহলে হয়ত অঙ্কুরেই ইসলামের বিনাশ ঘটত। বর্তমানেও ইসলামের মূল দর্শন সম্পর্কে কেউই জানার চেষ্টা করছে না। কাঁচ কাটতে হলে হিরে লাগে, লোহাকে লোহা দ্বারাই কাটতে হয়। ইসলামী দর্শন জানলে তবেই না এর সঠিক প্রতিষেধক দেওয়া যাবে। একটা কাজ করতে পারো। দেশে গিয়ে কচিকাঁচা স্তর থেকে ইসলামী দর্শন সঠিক ব্যাখ্যায় শেখানো শুরু করো। দেখবে ভবিষ্যতে ইসলামকে ঘৃণা করতে শিখবে লোক সকল। তখনই হিন্দু একজোট হবে—আর ইসলামী বর্বরদের সাথে লড়াই করার সমকক্ষ হয়ে উঠবে। এটাই হবে মালবিকা, শিপ্রা, শেফালিদের পুনরায় দুঃখজনক পরিস্থিতির শিকার না হওয়ার সঠিক প্রতিষেধক।

মহিম কোন কথা বলতে পারছে না। এই গ্রাম্য সরল সাদাসিধে মেয়েটা এত কথা জানল কি করে? এমন সব কথা বলছে, যার উত্তর বহু বড় বড় পণ্ডিতও দিতে পারবে না। কোথা হতে শিখল এত সব কথা!

—তুমি লেখাপড়া কতটা করেছো? আহাম্মকের মত মহিম প্রশ্নটা করেই ফেলল।

—পড়াশোনা আর করতে পারলাম কোথায়? তার আগেই তো সব শেষ হয়ে গেল!

—অর্থাৎ বাবা মায়ের মৃত্যুর জন্য কি পড়াশোনা করতে পারনি?

—সেটা একটা কারণ—তবে সেটাই শেষ কথা নয়। মেয়েটি বলল।

—তা'হলে?

—সেদিন ছিল অন্যান্য সাধারণ দিনের মতই একটা দিন। আশেপাশের মুসলিম বাড়িগুলোতে পূর্ব হতে চাপা হিন্দু বিদ্বেষ চলছিল, সেটা আমরা বুঝতেও পারছিলাম। আমার বয়স তখন দশ বছর। একদিন রাতে আমাদের বাড়িতে হামলা চালালো মৌলবাদীরা। উঠোনে বসে দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি আমাকে ধর্ষণ করার ফতোয়া দিল। আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছি। আমার মা বারে বারে ঐ দাড়িওয়ালা লোকটাকে হাত-পা ধরে কান্নাকাটি করতে থাকল। বাবা-দাদার হাত পা বাঁধা ছিল। মা বলল, "ঐটুকু মেয়ে—এতগুলো লোক! ও মরে যাবে তো?" কোন কথা শুনল না। আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে একটা কানফাটা আর্তনাদ করে উঠেছিলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। পরে শুনেছিলাম ওরা সবাই খুব খুশি হয়েছিল। আমি কোন প্রতিবাদ করিনি—বাধা দান করিনি বলে। তুমি একবার বলছিলে না—ওরা মৃতদেহের উপর ধর্ষণ করে না। আমি বাধা প্রদান করিনি কারণ ছিল ওরা আমার মৃতদেহটা নিয়ে শিয়াল কুকুরের মত টানা হেঁচড়া করছিল। আমার পিঠের নীচের বেডকভারটা রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেয়েটা বলল, "ওরা মৃতদেহকেও ছাড়ে না।"

—তুমি কে?

—এখনো বুঝতে পারোনি? আমি বর্তমানে শীলা পাল কথা বলছি।

—অন্য সময়ে?

—কখনো শিপ্রা ঘোষ, কখনো বা ইয়েজিদি কিশোরী। আমি সদা সর্বদা মুসলমান দ্বারা যৌন অত্যাচারের প্রতীক।

—তুমি এক্ষুণি যেটা বললে, তাতে তুমি তো মৃতা!

—তোমরা প্রতিশোধ নিতে না শিখলে আমার কোনদিন মৃত্যু হবে না। এই যেমন বর্তমানে চিন্তা করছি, আবার কোথায় গিয়ে কায়াধারণ করতে হবে কে জানে! এই যেমন এখন শীলা পালের দেহরূপ ধরে কথা বলছি—কামদুনিতে হলে আবার শিপ্রা ঘোষের রূপ পরিগ্রহ করব!

—আসলে তুমি কে?

—ধ্যাৎ, তুমি আসলেই বোকা। আমি শীলা-শিপ্রা-চিত্রামণি-শেফালি-মালবিকা সবারই অশরীরী আত্মা।

—তুমি অশরীরি? এতক্ষণ তাহলে আমি অশরীরীর সাথে কথা বলছিলাম! মা গো...

মাগো, মাগো করে গোঙাচ্ছিস কেন? সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যা—আমি প্রাতঃভ্রমণে বেরোচ্ছি। অবাক বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে মহিম মা'য়ের দিকে তাকিয়ে আছে। দরজার পাল্লা বন্ধের আওয়াজে মহিম উঠে গিয়ে সদর দরজার ছিটকিনিটা দিয়ে দিল।

বিনিকে ভালোবেসে

অম্বিকা গুহরায়

বাবার গোয়ার্তুমির কথা তো আমার জানা ছিল, তবু কেন বিনিকে ভালোবাসতে গেলুম। সে অনেক কথা। ভাবতে গেলেও মনটা রঙিন প্রজাপতির মতো স্বপ্নের আকাশে ভেসে যেতে চায়। সত্যি বলতে কী বিনিকে যে কোনদিন ভালোবাসবো তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। বিনিই যেন কেমন করে আমাকে একটু একটু করে ওর দিকে টেনে নিল। আমি শুধু ওর ইচ্ছার কাছে ধরা দিয়েছি মাত্র।

বিনির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছোটবেলার। একই পাড়ায় বাস। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা মনসার থানে উঠেছে, তার বাঁদিকের বাড়িটা বিনিদের। বাবা কীর্তন গেয়ে গেয়ে বেড়ায়। বিনিরও গানের গলাটা চমৎকার। বোধহয় বাবার থেকে পেয়েছে। আর চমৎকার ছবি আঁকে বিনি।

সকলের সঙ্গে আমরাও একসঙ্গে বড় হয়েছি। খেলাধূলা, হৈ-হুল্লোড় নিয়ে মেতে থাকত সবাই। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কামদা নদী। নদী পারাপারের রেস চলতো বন্ধুদের মধ্যে। পড়াশুনার মতো খেলাধূলাতেও আমি চৌখস ছিলুম। ফলে পাড়ার ছেলেমেয়েদের নয়নের মণি। আমার সাফল্যে বিনিকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি। পিছনে লাগতামও

বিনির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা জানাজানি হতেই বাবা তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। আমাকে শুনিয়ে মা-কে বলতে লাগলেন, মুখুজ্যে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছে তোমার ছেলে। ও পাড়ার চণ্ডী কীর্তনিয়ার মেয়ের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করেছে। কৈবর্ত্যের মেয়ে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। গ্রামে আর মানসম্মান নিয়ে থাকা যাবে না।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, শুনে রাখ, এসব বেলল্লাপনা এখানে চলবে না। সুরেন মুখুজ্যের পরিবারে আজ পর্যন্ত বামুনের মেয়ে ছাড়া অন্য কোন জাতের মেয়ে বউ হয়ে ঢোকেনি, আর ঢুকবেও না। মাথা থেকে ভূত ভাগাও। রেজাল্ট তো ভালোই করেছ, কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও। তারপর অন্য কথা।

বাবার মুখের উপর কোনদিন তর্ক করিনি। আসলে বাবা এত রাশভারী আর ব্যক্তিত্বময় যে চোখ তুলে কথা বলাই যায় না। তা না হলে অনেকগুলো কথা ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু মাথা হেঁট করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। যেন নীরবে বাবার কথাকেই সম্মতি দিলাম।

সব দোষ শুভটার। একটা কথাও যদি ওর পেটে থাকে। পইপই করে বলে দিলাম আমার আর বিনির কথাটা কাউকে বলিস না। দিব্যি খেয়েছিল শুভ। কিন্তু ওই যে খবরটা রাষ্ট্র করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেখা হোক একবার, বেটার মুণ্ডপাত যদি না করেছি।

সে যাই হোক, এখন উপায়। একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় গুলিয়ে উঠল। বাবাকে তো জানি, যে কথা সেই কাজ। তিন দাদার বউ-ই এসেছে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ঘর থেকে। মফঃস্বল এই ছোট্ট শহরে আমাদের পরিবারের নামডাক আছে। বাবা নিজে একজন এ্যাডভোকেট। আয় নেহাত মন্দ নয়। এছাড়া জমিজমা যা আছে তাতে কয়েক পুরুষ কিছু না করলেও অন্নের অভাব হবে না। বড়দা বড়বৌদিকে নিয়ে জামশেদপুরে থাকে। টাটা কোম্পানীর চাকরি। মেজদা, সেজদা তেমন পড়াশুনা করেনি। জমিজমা, পোলট্রি ফার্ম তারাই দেখাশোনা করে। বাবার একদম বাধ্য ছেলে। এ হেন পরিবারের ছেলে হয়ে আমি বংশের মুখে চুলকালি দেব, এটা বাবা কিছুতেই হতে দেবেন না।

বিনিকে ভালোবেসে যে এত কেচাল হবে তা ভাবতেও পারিনি। আসলে সমস্যা তো বিনি নয়, ওর বংশ পরিচয়। কৈবর্ত্যের মেয়ে, নীচু জাত। বাবা সব ব্যাপারে আধুনিক, শুধু এই একটা ব্যাপারে কেন সেকেলে রয়ে গেলেন, তা কোনদিনও মালুম হল না।

খুব। দুটো করে বিনুনি বাঁধত। সুযোগ পেলেই বিনুনিতে গিঁট বেঁধে দিতাম। রাগ করত। একদিন বলেছিলাম, ওরকম বিনুনি বাঁধিস কেন, আমার একদম ভালো লাগে না। ব্যস্ পরদিন থেকে বিনুনি বাঁধা বন্ধ। বিনি যে অমায় পছন্দ করে এটা জানতাম। তাই নিজের স্বার্থে ওকে কাজে লাগাতাম।

বিনি, আমার লাইফ সায়েন্সে কতগুলো আঁকা আছে, এঁকে দিবি।

দাও। পরদিনই চার-পাঁচটা আঁকা করে এনে দিয়েছিল। কখনও বলতাম, শিবুদের বাগান থেকে পেয়ারা পেরে এনেছি। কী করা যায় বলতো? বিনি তক্ষুণি পেয়ারাগুলো নিয়ে গিয়ে কেটে নুন-লঙ্কা মাখিয়ে আনত। বলত, অন্তুদা, যা খেতে হয়েছে না, আমি অলরেডি একটা সাঁটিয়ে দিয়েছি। মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসতো। কান দুটো নেড়ে দিয়ে বললাম, আমার আগেই খেয়ে নিলি। মুখটা গম্ভীর হয়ে যেত। মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। মজা লাগত খুব। বলতাম, নে, হাঁ কর। ওর মুখে আস্ত একটা পেয়ারার কোয়া ঢুকিয়ে দিতাম। মুখ নাড়তে না পারলেও মুখটা যে হাসিতে ভরে উঠেছে তা বুঝতে পারতাম। একবার খেলতে গিয়ে পায়ে খুব লেগেছিল। মনসাতলার বেদিটায় বসে আছি। বিনি কোথা থেকে চুন-হলুদ নিয়ে এসে হাজির। পা-টা একটু সোজা করে দাও তো অন্তুদা, চুন-হলুদটা লাগিয়ে দিই। প্রায়ই পিছন থেকে আমার চোখ টিপে ধরে নিজেই বলে উঠতো, বল তো আমি কে? আমি বলতাম দূর বোকা, বলেই যখন দিলি তুই বিনি ছাড়া আর কে হবি?

একদিন চোখ টিপে ধরে চুপ করে আছে। মজা করার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, বল তো তুমি কে? চোখটা ছেড়ে দিয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বলল—তোমার বিনি।

সদ্য আঠারো পেরিয়েছি আমি, বিনির বোধহয় পনেরো হবে। পরের বছর মাধ্যমিক দেবে। ছোটবেলার খেলা খুনসুটিগুলো ছাড়িয়ে আমরা এখন বয়ঃসন্ধিতে। বিনির শরীরে যৌবন এসেছে। এরকমভাবে কাছাকাছি আসাটা আর ভালো দেখাচ্ছে না। ছোট্ট একটু হেসে বিনির কথাটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। মনের মধ্যে কিন্তু কথাটা ঘুরপাক খেতে লাগলো, বাড়ি আসার পরও।

শুভই প্রথম বলেছিল কথাটা, আমার বিশ্বাস হয়নি।

বিনি কিন্তু তোকে ভালোবাসে।

কী করে বুঝলি?

সকলের সঙ্গে খোলা মনে মিশলেও তোর কাছে এলে কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। এটা আগে ছিল না।

তাতে কী প্রমাণ হল।

অন্তু, দুই কোনদিন বিনির দিকে চাসনি বলে দেখতে পাসনি। বাইরে থেকে দেখলে কিন্তু ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়।

শুভর কথায় আমার মনেও সন্দেহটা দানা বেঁধে উঠল। লক্ষ্য করেনি ঠিকই, কিন্তু কয়েকদিন ধরে বিনির আচরণে একটা অন্যরকম ভাব মনে ফুটে উঠল। রাত জেগে আমার আঁকা করে দেওয়া শুধুই কী আমি পাড়ার একজন কেউকেটা বলে। আর পায়ে চুন-হলুদ লাগিয়ে দেওয়া। কই খেলতে গিয়ে শুভ, শিবু, বঙ্কু, নিতাই অনেকেরই তো চোট লাগে। বিনিকে এতটা উতলা তো কারুর জন্য হতে দেখিনি। সেদিন যে বলল 'তোমার বিনি'। তবে? শুভর কথা তলিয়ে দেখতে গিয়ে আমি যেন কোন অতলে তলিয়ে গেলাম। একটা শিহরণ খেলে গেল সারা শরীরে। আড্ডাটা জমলো না, বাড়ি ফিরে এলাম।

পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কিন্তু সুযোগ তেমন হচ্ছিল না। সেদিন বাড়ির রোয়াকে বসে কিছু একটা খাচ্ছিল। একা। জিজ্ঞাসা করলাম কী খাচ্ছিস বিনি।

কামরাঙা। খাবে।

এ্যাঁ, খুব টক।

নাগো, একদম গুড়ের মতো মিষ্টি। নুন-লঙ্কা দিয়ে মেখেছি।

দে। কিন্তু একটা কামড় দিয়েই বুঝতে পেরেছি এমন টক্ পৃথিবীতে আর কিছু হয়না। আমার মুখের অবস্থা দেখে বিনি তো হেসেই খুন। এই সুযোগটাকেই কাজ লাগাতে হবে। বললাম, আমার কষ্ট হলে তোমার খুব আনন্দ হয়, না বিনি।

মুহূর্তে ফর্সা মুখটায় বর্ষার কালো মেঘের আঁধার নেমে এল। চোখ দুটোয় জল টলটল করে উঠল। বললাম,আরে, আমি তো ইয়ার্কি করছি।

কিছু বলল না। মুখটা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার বুকটা কিন্তু আনন্দে ভরে উঠল। যা চেয়েছিলুম তা পেয়েছি। এই কয়দিনে আমিও মনে মনে সহস্রবার বিনির কথা চিন্তা করেছি। ভালোইবেসে ফেলেছি বোধহয়। বললাম, একদিন কামদায় যাবি শুশুক দেখতে। সবে বর্ষা শেষ হয়েছে। ভরা নদী। এই সময় শুশুকের ডিগবাজি দেখতে পাওয়া যায়।

চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকালো। তারপর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

—শুধু দুজনে যাব। পরশুদিন, দুপুরবেলা।

—ঠিক আছে।

বিনির মনের কথা জানা গেছে। আমার মনের কথাটাও ওকে জানাতে হবে। শুশুক দেখা তো ছল। আসলে কামদার পাড়ে দুপুরের নির্জনতাকে কাজে লাগাতে হবে। বলতে হবে

নিজের মনের কথা। স্পষ্ট করে।

দশ মিনিট হল এসেছি। দুজনেই চেয়ে আছি কামদার নিস্তরঙ্গ জলের দিকে। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যের আলোয় কামদার জল ঝিকমিক করছে। দূরে এক মাঝি উজান ঠেলে চলেছে কোন নিরুদ্দেশের দেশে। মুখে তার মিষ্টি সুরের ভাটিয়ালি গান। বিনির দেখলাম সুরটা জানা।

প্রায় একই সুর গুনগুন করছে নদীর দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে।

যা বলব বলে এসেছি, বুকের মধ্যে যতই সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করি, ততই যেন কেমন গুলিয়ে যেতে চায়। ছোট্ট একটা কথা। তবু যেন সাহস করে মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। তাই ছলনার আশ্রয় নিলাম।

—বিনি।

ডাক শুনে তন্ময়তা কেটে গেল। আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

—আমার জন্য তুই কী করতে পারিস।

হেঁয়ালিটা যেন ঠিক বুঝতে পারেনি। একইরকম ভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, কী করতে বল।

যদি বলি তোকে কামদায় ডুবতে। আমার জন্য মরতে পারবি?

চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নদীর দিকে তাকিয়ে, যেন তাকে সাক্ষী রেখে বলল, পারবো অন্তুদা, তোমার জন্য মরতেও পারবো। কথা বলতে বলতে দু-পা এগিয়েও গিয়েছে বিনি। বিশ্বাস নেই। ভালোবাসা বুঝি এরকমই হয়, অন্ধের মতো। পিছন থেকে আমি বলে উঠলাম, তোর কিছু হলে আমি কী নিয়ে বাঁচবো।

ঝটিতে ঘুরে দাঁড়ালো আমার দিকে। তারপর বিস্ময়ভাবটা কেটে গিয়ে মুখের কোণায় হাসির রেখা ফুঠে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে ওর হাতদুটো ধরলাম। এর আগেও কতবার বিনির হাত ধরেছি। কিন্তু এই প্রথমবার ওর হাত ধরতে আমার হাতদুটো কেঁপে গেল।

প্রেমে পড়লাম পরস্পরের। তুই থেকে কখন তুমিতে চলে এসেছি বুঝতেও পারিনি। চোখে চোখ রেখে কথা বলার সময় শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করতাম। অনেকে মধ্যে থেকেও কেমন যেন ছাড়াছাড়া, আলাদা। কখনও বা দুজনে আলাদাই হয়ে যেতাম সকলের থেকে। বিনির কড়ে আঙুলটা নিয়ে খেলা করতে খুব ভালো লাগতো। একটা অদ্ভুত অনুভূতি মনটাকে ছেয়ে থাকতো।

নির্জনে বিনিকে দু-চারবার চুমুও খেয়েছি।

আমরা পরিবর্তনটা শুভর চোখেই প্রথম ধরা পড়েছিল। অস্বীকার করিনি। বিনিকে নিয়ে আমি নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি সেটাও বললাম। শুভ কিন্তু কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না। একটু গম্ভীর হয়ে বলল, কাকাবাবু মেনে নেবেন।

এ প্রশ্নটা আমার মধ্যেও যে আসেনি তা নয়। গোঁড়া ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে আমি। বললাম, ও আমি ম্যানেজ করে নেবো।

—দেখিস্। মেয়েটাকে ভাসাস না।

বিনিকে ছাড়া অন্য কিছু ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাঁচাও নয়। শুধু বললাম, আরে, দূর, চিন্তা করিস না। আর দ্যাখ্, ব্যাপারটাকে চেপে রাখিস, জনে জনে রাষ্ট্র করে বেড়াস না।

তারপর আজকে বাবার এই রণহুঙ্কার মূর্তি। কেশর ফুলিয়ে এখনই যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আরও কিছু বলার আগে বাড়ি থেকে সট্‌কে পড়লাম।

মনসাতলাতেই দেখা হয়ে গেল শুভর সঙ্গে। রাগে তখন আমার গা রি রি করছে। বললাম, দিয়েছিল তো সব মাটি করে।

—কী করলাম আবার।

—নেমন্তন্ন পত্র ছাপিয়ে আমার আর বিনির খবরটা গ্রামের সকলকে জানিয়েছিস।

—কে বললে।

—বলবে আবার কে? বাবার ধেঁতানি খেয়ে এলাম। তুই ছাড়া এ ব্যাপারে আর কে জানে?

—ন্যাকামি করিস না। যত্রতত্র দুজনে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াবি আর গ্রামের লোক তো সব অন্ধ কিছুই দেখতে পাবে না। সেদিন হাটবারে গ্রামের অনেকেই তোদেরকে কামদার ধারে দেখেছে। তোর মেজদা পর্যন্ত।

এখন উপায়।

বাবার সামনে বুক ঠুকে দাঁড়া।

ক্ষেপেছিস! ও বুড়ো একেবারে মিলিটারী। কামানের মুখে বেঁধে আমাকে সেফ্ উড়িয়ে দেবে।

এবার শুভ সিরিয়াস। তাহলে অন্তু, এখন কী করবি।

শোন শুভ, আমার গ্রাজুয়েশনটা কম্‌প্লিট হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় গিয়ে কস্ট অ্যাকাউন্ট পড়ব ভাবছি। ভালো করে খাটলে দু-তিন বছরে একটা জায়গায় চলে যেতে পারবো। ততদিনে বিনিও অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে। কলকাতায় নিয়ে চলে যাব ওকে। ঘর বাঁধবো আমরা। বুকের প্রদীপ জ্বালিয়ে স্বপ্ন দিয়ে মোড়া আমাদের ভালোবাসার ঘর। বিনির সঙ্গে এখন

আর দেখা করা সম্ভব নয়। তুই ওকে একটু বুঝিয়ে বলিস। বিনিকে আরও নিবিড় করে কাছে পাওয়ার জন্য আজ ওর থেকে আমাকে দূরে চলে যেতে হবে।

তারপর তিনটে বছর কেটে গেছে। কস্টের শেষ সেমিস্টারের আগেই একটা ফার্মে চাকরী পেয়ে গেলাম। এতদিনে আমার স্বপ্নপূরণ হতে চললো। একটা বাসা ভাড়া নিয়ে সবে হোস্টেলের ঘরে এসে বসেছি, গার্ড এসে বলল, দাদাবাবু আপনার চিঠি।

হাত বাড়িয়ে নিলাম খামটা। শুভ লিখেছে।

জামাকাপড় না ছেড়েই চিঠিটা খুলে বসলাম। কিন্তু এ কি লিখেছে শুভ! চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল, মাথা ঘুরছে হাত কাঁপছে মনে হচ্ছে চিঠিটা ধরে রাখার মতো শক্তিও আমার নেই। আমার চেতনা যেন কোন অতল অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শুভ লিখেছে, বিনির বিয়ে। এ মাসের ১৭ তারিখ।

ছুটে যাব ভেবেছিলাম। সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেব। কিন্তু কারণটা পড়ার পর নিশ্চুপে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারিনি। কলেজে উঠে বিনি একটি ছেলের প্রেমে পড়ে। আমি যখন কস্টের বইগুলোর মধ্যে ডুবে বাস্তবের ঘর গাঁথছি তখন বিনি একটু একটু করে আমার থেকে অনেক দূরে অন্য এক জগতে হারিয়ে যাচ্ছিল।

১৭ই ফেব্রুয়ারি। বিনির বিয়ে।

'তোমার বিনি'—একদিন নিজেই প্রাণ খুলে বলেছিল। আজ এক অতল অন্ধকারে ডুবিয়ে আমার বিনি চললো আর কারো ঘর আলো করতে।

ইয়ার এনডিং-এ বাড়ি এসেছিলাম। বাবা বললেন, তোমার দাদা জামশেদপুরে একটা মেয়ে দেখেছেন। আমাদেরই ঘর। পারলে একবার এই ছুটিতে জামশেদপুরটা ঘুরে এস।

সূর্যটা অস্ত গেল এইমাত্র। তারই ছেটানো আবীর মেখে আকাশটা এখনও লাল। দূরে নদীর পাড় ভাঙার শব্দ মৃদুভাবে কানে আসছে। কতক্ষণ যে একটা ঢিবির উপর বসে বয়ে যাওয়া নদী দেখছিলাম খেয়াল নেই। একদিন এই নদীকে সাক্ষী রেখেই বিনিকে আপন করে নিয়েছিলাম। আজ এই নদীর জলে ওর শেষ অস্তিত্ব বিসর্জন দিতে এসেছি।

সবাই বলল, আজকের সমাজে জাতের অহংকারটা মেনে নেওয়া যায় না।

আমি চুপ করে থেকেছি। বুকের ভিতর নিদারুণ কষ্টের কথাটা কারুকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

"সন্ন্যাসী ধনী লোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিবে না-তাঁর কাজ গরিবকে নিয়ে। সন্ন্যাসীর কর্তব্য খুব যত্নের সঙ্গে প্রাণপণে গরিবদের সেবা করা এবং এরূপ সেবা করতে পারলে পরমানন্দ অনুভব করা। আমাদের দেশের সকল সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের ভিতর ধনী লোকের তোষামোদ করা এবং তাদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করার ভাব প্রবেশ করাতে সেগুলি উৎসন্ন যেতে বসেছে। যথার্থ সন্ন্যাসী যিনি, তাঁর কায়মনোবাক্যে এটা ত্যাগ করা উচিত। এভাবে ধনী লোকের পেছনে ঘোরা বেশ্যারই উপযুক্ত, সংসারত্যাগীর পক্ষে নয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মুক্তির দূত

ডাঃ অরুণকুমার গিরি

পোলিও রবিবার। সকাল থেকেই দারুয়া পল্লীমঙ্গল সমিতিতে উদ্যোক্তাদের ব্যস্ততা চোখে পড়ার মত। কেননা পোলিও দূরীকরণের সংখ্যাতত্ত্বে এই অঞ্চলটি কখনো পাশ মার্ক পায় না। সকল সময়েই আণ্ডার কন্‌সিডারেশানের আখ্যা পায়। অঞ্চলটি মুসলমান অধ্যুষিত। এরা এখানকার জনসংখ্যার প্রায় চল্লিশ শতাংশ। কোন নতুন ব্যক্তি এখানে এলে চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারে যে এটা মুসলিম এরিয়া। জায়গাটি বালুকাময়, ছোট খাটো মালভূমির মত। চারিদিকে বাদাম গাছ আর বাঁশের ঝাড়। রাস্তার দু'ধারে বাঁশের বেড়া যাতে প্রায়ই কাপড়চোপড়, কাঁথা, বালিশ, বিছানা, চাদর ইত্যাদি শুকোতে দেখা যায়। চারিদিকে মুরগী, বাচ্চা সহ এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রায় অধিকাংশ বস্ত্রহীন মানবশিশুরা ইতস্ততঃ দৌড়ঝাঁপ করছে। এখানকার পুরুষেরা আগে চাষবাস করতো, বাবুদের বাড়িতে দিনমজুরী খাটতো বা গরুর গাড়িতে মাল বওয়ার কাজ করতো। দিনকাল পাল্টেছে। গ্রামে আর তেমন আগের মত গরুবাছুর নেই—তার জায়গায় ছাগল ভেড়ার পালনপোষণ চলছে। অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে এখানকার লোকেরা রিক্সাওয়ালা হয়েছে। প্রায় তিন কি.মি. দূরে ইংরেজ আমলের ছোট্ট শহর কাঁথি। অভ্যাস পাল্টেছে, হেঁটে যাওয়ার পরিবর্তে লোকেরা রিক্সায় যাতায়াতে অভ্যস্ত হয়েছে। আর মহিলারা ঘর সংসারের কাজকর্ম সেরে হাঁস মুরগী দেখাশোনা, ছাগল-ভেড়া চরানো, বাদাম ও বাঁশ জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা কুড়িয়ে জ্বালানী সংগ্রহ করা এখন এদের নিত্যদিনের কাজ। বেশিরভাগ পুরষের একাধিক বিবি রয়েছে। প্রায় প্রতিটি পরিবারে আট-দশটি বাচ্চা। পরিবার পরিকল্পনার কথা সরকারীবাবুরা ''ছোট পরিবার সুখী পরিবার'' বলে বোঝাতে গেলে ''আল্লার দোয়া'' বলে ওদের অভিমত জানায়। মোট কথা কোনরকমে বেঁচেবর্তে থাকা আর মুরগী ছানার মত বংশবিস্তার করা ছাড়া এদের করণীয় আর কিছুই নাই। এ হেন পরিস্থিতিতে পাঁচ বছর বয়স অবধি বাচ্চাদের পোলিও খাওয়ানো পরিবারের পুরুষদের কোন সহযোগিতা পাওয়া যায় না—কেননা, তাদের বদ্ধমূল ধারণা—পোলিও খাওয়ালে পুরুষেরা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়বে। তাই পোলিও প্রোগ্রাম এখানে সফলতা পায় না।

পোলিও প্রোগ্রামে কিছুটা মান্যতা পেতে উদ্যোক্তারা এবারে উঠে পড়ে লেগেছে। অঞ্চলটি যেহেতু মুসলমান অধ্যুষিত, সেইজন্য স্থানীয় স্ব-রোজকারী মহিলা সমিতির তিন চারজন সংখ্যালঘু মহিলাদের এ ব্যাপারে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। আহ্বান পেয়ে আমিনা বিবি তার দুজন সহযোগী নিয়ে সকাল সাড়ে নটায় দারুয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছেন। এর কিছু সময়ের মধ্যে সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তরের দিদিমণিরা এসে পৌঁছান।

আমিনা বিবির একটা পূর্ব ইতিহাস আছে। একত্রিশ বছর বয়সী মকবুলের প্রথমা বিবি লুৎফার তৃতীয় বাচ্চা প্রসবের সময় মারা যাওয়ার পর মকবুল সেখ পনেরো বছর বয়সী আমিনাকে সাদি করে। এর প্রায় তিন বছর পরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় একশো দিনের কাজের প্রকল্প শুরু হয়েছে। রাস্তাঘাট বানানো, পুকুর কাটা প্রভৃতি একশো দিনের কাজের প্রকল্পে নেওয়া হয়েছে। আমিনার সাদির দু'বছরের মাথায় তার পেটে বাচ্চা এসেছিল। কিন্তু রিক্সাওয়ালা মকবুল দুপুরে মদ গিলে ঘরে এসেই আমিনার শরীর চেয়েছিল। সামনে আগের পক্ষের তিন বছরের ছেলে তার বাপের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। লজ্জা সরম বাঁচাতে আমিনা মকবুলকে সঙ্গ দেয়নি—আর সেই রাগে মকবুল আমিনার পেটে এক সজোরে লাথি মেরেছিল। ফলে আমিনার অ্যাবরসন হয়ে যায়। অসুস্থ হয়ে সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিছুদিন ভর্তি ছিল। ডাক্তারবাবু আমিনাকে সাবধান করে

বলেছিলেন যে অন্ততঃ বছর খানেকের মধ্যে যেন পেটে বাচ্চা না আসে।

ঘরে ফিরে আমিনার তেমন খাবার জুটতো না। মকবুলের আয় বা কতটুকু। যা আয় হয় তা মদের সেবায় চলে যেত। মকবুল ডাক্তারের পরামর্শ মানলো না—অল্পদিনের মধ্যেই আমিনার আবার পেটে বাচ্চা এলো। সংসারে তেমন খাওয়া জোটে না, কখনো আধপেটা, কখনো উপোস এইভাবে আমিনার চার পাঁচ মাস কাটলো। অভাব অনটনে আমিনা বাধ্য হয়ে একশো দিনের প্রকল্পে পুকুরকাটার কাজে নাম লেখালো। পুকুরের গভীর থেকে মাটির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কাঠের তক্তার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হতো। রোগা শরীর, দুর্বল। মাটির ঝুড়ি নিয়ে উপরে ওঠার সময় হঠাৎ মাথা ঘুরে আমিনা নীচে পড়ে অজ্ঞান হলো,—কাপড় চোপড় রক্তে ভেসে গেল। সাথীরা সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তাররা বাধ্য হয়ে অপারেশন করলো। আমিনা সে যাত্রায় বাঁচলো-কিন্তু আর কোনদিন সে মা হতে পারবে না বলে ডাক্তারবাবুরা জানালেন। এই খবর শোনার পর মকবুল আমিনার প্রতি চটে গিয়ে বললো—তুই যখন আর বাচ্চা বিয়তে পারবি না তবে তোকে রেখে লাভ কি? তালাক-তালাক-তালাক বলে আমিনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিন। এই হলো আমিনার পূর্বকথা।

তালাকপ্রাপ্ত আমিনা এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বধ্যপরিকর। তার মত আর কোন মহিলা যাতে উৎপীড়নের শিকার না হয় তারজন্য বিশেষ সচেষ্ট হলো ও পঞ্চায়েতের কাজকর্মে লেগে গেল।

শিশুদের পোলিও খাওয়ানোর উপকারিতা সম্বন্ধে পাড়ায় পাড়ায় মুসলমান মহিলাদের বোঝাবার সময় অনেক মহিলা আমিনাকে তাদের মনে কথা জানালো—আমাদের মরদদের শারীরিক চাহিদা মেটানো নিয়ে একেবারে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি। সময় নেই, অসময় নেই, রিক্সা চালিয়ে বা কাজ থেকে ফিরেই তাদের দেহের চাহিদা মেটাতে হবে, বাচ্চা-কাচ্চা কাছাকাছি যেই থাকুক না কেন, কোন কিছুতেই তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। আমিনাদি, একটা কিছু ব্যবস্থা কর যাতে আর পেটে বাচ্চা ধরতে না হয়। কিন্তু সাবধান—মরদরা যাতে কোনক্রমে টের না পায়। তাহলে নানান অত্যাচার সহ তোমার মত আমাদের ভাগ্যেও 'তালাক' জুটবে। আমিনা এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী। তাই আমিনা কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে তার অঞ্চলের মুসলমান মহিলাদের চুপি চুপি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশনও করিয়ে দেয়। এতে মহিলারা টাকাও পায় আর অবাঞ্ছিত গর্ভ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তিও পায়। আমিনা তাদের কাছে মুক্তি-দুত।

গ্রহণ

সমীর গুহরায়

সূর্য তো এখনও আলো ছড়াচ্ছে দিগন্তে
তবু ভারত আকাশে কেন এত অন্ধকার,
একটা অন্ধ হিংসে তরবারি
দেশকে চারদিক থেকে টুকরো করতে উদ্ধত
ফেনিল সমুদ্র যেন
গর্জে আছড়ে পড়তে চাইছে তটভূমিতে।
ভারতভাগ্যবিধাতা নিশ্চুপ, নতজানু
তবে কি হার স্বীকার করে নিয়েছে
অন্ধ নিয়তির কাছে!
জেহাদী সন্ত্রাস—
কুঁড়ে কুঁড়ে খায় কোমল হৃদয়
জীবনের তো আরও অনেক মানে হতে পারত,
তবে কেন এ সংকীর্ণতা—
মনের দুয়ার খুলে একবারও কি দেখবে না

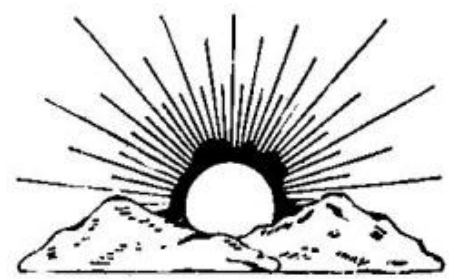

হাজার আলোর ঝিকিমিকি
নেবে আসছে ঐ সূর্যের গা বেয়ে।
রাহু হয়ে কেন আজ
অন্ধকারের খেলায় মেতে ওঠো জেহাদী
যতই গিলে ফেল—
প্রকৃতির নিয়মে তা আবার
উগ্‌রে দিতে হবেই।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে বস্ত্রদান

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত জয়াতলায় হিন্দু সংহতির উদ্যোগে এক বস্ত্রদান উৎসব পালন হয়। একই সঙ্গে ক্ষাত্রজাগরণ দিবসও পালিত হয়। উল্লেখ্য যে সংহতি সভাপতির ভগ্নী ও ভগ্নীপতি শ্রীমতি তপতী পাঁজা ও শ্যামল পাঁজা উভয় অনুষ্ঠানেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জয়াতলার কালীমন্দির ছিল অনুষ্ঠান স্থল।

বেলা ১১টার সময় যজ্ঞের মধ্য দিয়ে ক্ষাত্রশক্তি দিবস শুরু হয়। যজ্ঞশেষে উপস্থিত সকলের কপালে যজ্ঞের তিলক পরিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ১০০ জনের বেশি যুবক-যুবতী শপথ বাক্য পাঠ করে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বর্গক্ষত্রিয়, পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়, কর্মক্ষত্রিয় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রায় ৫০০ মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।

এরপরে শুরু হয় বস্ত্রদান। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ৩০০ জন নরনারী-কে বস্ত্রদান করা হয়। মেয়েদেরকে শাড়ি, চুড়িদারের পিস্ ও পুরুষদেরকে টি-শার্ট, ধুতি দেওয়া হয়। হিন্দু সংহতি সহসভাপতি দেবদত্ত মাঝি, সহ সম্পাদক সুন্দর গোপাল দাস ও কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতি সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া টোটন ওঝা, স্নেহা নস্কর এবং অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রমুখ কর্মী রাজকুমার সরদার সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনার কাজ করেন।

২০শে সেপ্টেম্বর জীবনতলা থানার হেদিয়া-তে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে এবং বড়বাজার অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী নরেশজী সুলতানিয়ার সহযোগিতায় এক বস্ত্রদান শিবির হয়। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও প্রায় ২৫০ জন নর-নারীকে বস্ত্রদান করা হয়। হেদিয়া প্রাইমারী স্কুলে এই অনুষ্ঠান হয়। নরেশজী সহ চারজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নিজে হাতে বস্ত্রবিতরণ করেন। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সুজিত মাইতি, সুন্দর গোপাল দাস, সাগর হালদার কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অঞ্চল প্রমুখ স্বপনবাবু এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলন মাস্টার অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ইসলামপুরে মন্দিরের জমি দখল

উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের নির্ভয়চণ্ডী গ্রামের বাসিন্দা শ্রী প্রফুল্ল দাস-এর জমির উপর দীর্ঘদিনের একটি মন্দির আছে। প্রফুল্লবাবু নিজে তপশিলী জাতিভুক্ত এবং অঞ্চলটিতেও তপশিলী ও আদিবাসী শ্রেণির লোকের বাস। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামবাসীরা এখানে পূজাআর্চা করে আসছেন। উল্লেখ্য যে, হিন্দুদের দেবস্থানের পাশেই মুসলমানদের একটি কবরস্থান আছে।

সম্প্রতি মুসলমানেরা কবরস্থান সম্প্রসারণ করতে গিয়ে হিন্দুদের জমি দখল করার কথা বলে। এমন কি মন্দিরটিও তারা দখল করে সেখানে কবরস্থান করতে চায়। তারা হিন্দু গ্রামবাসীদের হুমকি দেয় যে, তাদের এ কাজে যে বাধা দিতে আসবে তাকে প্রাণে মেরে ফেলে লাশ গুম করে দেবে। চোপড়া থানায় অভিযোগ করেও কোন লাভ হয়নি।

শেষমেশ, গ্রামবাসীরা কোর্টে একটি জোর করে জমি দখল সংক্রান্ত মামলা দায়ের করে। কিন্তু তাতে কোন সুরাহা হয়নি। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, প্রশাসনের লোকেদের সামনেই মুসলমানরা মন্দির ভেঙে দিয়ে সেখানে কবরস্থান গড়ে তুলেছে। এই নিয়ে এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

হিন্দুর জমি দখল করে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে রসুলপুরে

উত্তর ২৪ পরগণার গোপালনগরে জোর করে জমি দখল করে তৈরি হচ্ছে মসজিদ। কেরল ওয়াকফ্ বোর্ড মসজিদ নির্মাণে টাকা জোগাচ্ছে।

অভিযোগ, আদালতের নির্দেশে ওই জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হলেও তা উপেক্ষা করে মসজিদ তৈরিতে মদত দিচ্ছে পুলিশ-প্রশাসন। এমনকি স্থানীয় পঞ্চায়েতও মসজিদ তৈরির প্ল্যান অনুমোদন করেনি। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জানায় জমির মালিক। এলাকার মানুষ এই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছে। সম্প্রতি নহাটা-গোপালনগর রাস্তা অবরোধও করেন এলাকার মানুষ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে গোপালনগর থানার অন্তর্গত রসুলপুর গ্রামে। রসুলপুর গ্রামে দুই হাজারের উপর মানুষের বাস। সকলেই হিন্দু। মাত্র দশ সদস্যের একটি মুসলিম পরিবার সেখানে বাস করে।

রসুলপুরে পাল্লা রোডে গোলকপুর মোড়ে রাস্তা সংলগ্ন দেড় শতক জমির মালিক প্রদীপ তালুকদার। সামান্য আয়ের চাকরি তার। স্ত্রী শ্যামলী তালুকদার হস্তশিল্পের কাজ করেন। পৈতৃক জমিতে একটি দোকানঘর তৈরি করার চেষ্টা তারা বেশ কিছুদিন ধরে করছিলেন। প্রায় দেড় মাস আগে গ্রামের মন্টু গাজি ও ইয়ানুর গাজি তার ভাইদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতার সঙ্গে যোগসাজস করে প্রদীপবাবুর জমিতে মসজিদ তৈরির কাজ শুরু করেন। প্রদীপবাবুরাও তৃণমূল সমর্থক। শ্যামলীদেবী জানান, দল ও স্থানীয় ক্লাবকে সব জানানো হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল নেতার মদত থাকায় কোন কাজ হয়নি। এমন কি থানায় লিখিত অভিযোগ করতে গেলে তৃণমূল

নেতাদের চাপে পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে উল্টে ধমক দেয় বলে অভিযোগ। গোপালনগর থানার আই সি লিটন রক্ষিত শ্যামলী দেবীকে ধমক দিয়ে বলেন, 'এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াবেন না।'

পুলিশ প্রশাসনের এই গা-ছাড়া মনোভাব দেখে জমির মালিক প্রদীপ তালুকদার বনগাঁ আদালতে ওই জমিতে ১৪৪ ধারা জারির আবেদন করেন। তা মঞ্জুর করেন বিচারক। পাশাপাশি আদালতে মসজিদ তৈরির উপর স্থগিতাদেশের আবেদন করেন প্রদীপবাবু। এরপরই, বিচারক বিএলআরও অফিস এবং গোপালনগর থানাকে জমির মালিকের খতিয়ান এবং জমির বর্তমান চরিত্র জানানোর নির্দেশ দেন।

পাল্লা পঞ্চায়েতের প্রধান ডলি মন্ডলের স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা আবু মন্ডল বলেন, ওই জমি প্রদীপ তালুকদারের। ওই জমিতে মসজিদ তৈরির জন্য কোন অনুমতি দেওয়া হয়নি। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে মসজিদটি নির্মাণ হচ্ছে।

"সন্ন্যাস ব্যবস্থায় আমি খুব বেশী বিশ্বাসী নই। ঐ ব্যবস্থার অনেক গুণ আছে। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত। কিন্তু ভারতে সন্ন্যাস-ভাবেই সমস্ত শক্তি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা সন্ন্যাসীরা শ্রেষ্ঠ শক্তির প্রতীক। সন্ন্যাসী রাজার চেয়ে বড়। ভারতবর্ষে এমন কোন শাসক-নৃপতি নাই, যিনি 'গৈরিকবসন'-ধারীর সম্মুখে বসিয়া থাকিতে সাহস করেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

গোমাংস বিক্রয় বন্ধ

মথুরাপুর থানার তালুক রানাঘাটা বাজারে গোমাংস বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছিল স্থানীয় হিন্দুরা। তারপর থেকেই মুসলমানরা বাজারের হিন্দু মালিকের দোকান থেকে জিনিস কেনা বন্ধ করে দিয়েছিল। মুসলমানরা কোন একটা অছিলায় বাজার আক্রমণের পরিকল্পনা করে। বাজারে নিশিকান্ত প্রামাণিকের বাড়ির সামনে লিয়াকত নস্করের পান-বিড়ির দোকানে মুসলমানরা আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু সামান্য কয়েকটি কাগজপত্র ছাড়া আর কিছুই পোড়েনি। রাত তিনটের সময় পুলিশ এসে প্রাথমিক তদন্ত করে যায়। ১লা অক্টোবর সকাল সাতটা নাগাদ প্রায় দু'শ জন মুসলিম বাজারে জড়ো হয়। তাদের অভিযোগ হিন্দুরা লিয়াকতের দোকানে আগুন লাগিয়েছে। হঠাৎ ভিলেজ পুলিশ সাদিক মোল্লা মুসলিমদের উত্তেজিত করে তুললে মুসলমানরা মারমুখী হয়ে রানাঘাটা বাজার আক্রমণ করে। তারা ১১টি দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। কার্তিক দাস নামক এক দোকানদারকে তারা মারধোর করে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিকদের পক্ষ থেকে মথুরাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানা তাদের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। এই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

ইসলামিক আধিপত্যর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো হিন্দুরা

গত ৫ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত কাঁপসাড়িয়া গ্রামে আল্লাদির মোড়ে একটি মোটরবাইক সজোরে এসে এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। বাইকে দুইজন মুসলিম যুবক ছিল। প্রতিবাদ করলে তারা বেশ করেছি, যা পারিস করে নিস বলে শাসাতে থাকে। তখন এলাকার উত্তেজিত জনতা ছেলে দুটিকে উত্তম-মধ্যম মার দিয়ে ছেড়ে দেয়। ঐদিন রাত ১১টা নাগাদ প্রায় ৭০-৮০ জন মুসলমান বড় তাজপুর গ্রাম থেকে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর চড়াও হয়। এলাকার সাধারণ মানুষ এই আক্রমণ থামাতে জড়ো হয়। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় ছুটে আসে। পুলিশ মুসলমানদের কিছু না বলে হিন্দুদের উপর লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। স্থানীয়রাও শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং পুলিশকে সমস্ত ঘটনা অবগত করে। তখন পুলিশ উভয় পক্ষকে হটিয়ে দিয়ে এলাকায় পিকেট বসিয়ে দেয়।

এরপর মুসলমানরা গত ৮ই আগস্ট বড় তাজপুরে বাজার দোকান বন্ধ রেখে কালাদিবস পালন করে। ঐদিন বিডিও-র উদ্যোগে একটি শান্তি মিটিং ডাকা হয়। মুসলমানরা উপস্থিত হলেও, বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা ছাড়া এলাকার সাধারণ মানুষ ওই মিটিং বয়কট করে। এলাকায় একটি চাপা উত্তেজনা রয়েছে ও পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে।

মন্দিরের কাছে মসজিদ

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হালালপুর অঞ্চলে কয়েকশো বছরের পুরানো দুর্গামন্দির আছে। প্রতিবছর পূজা উপলক্ষে বড়ো মেলা ও হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। সারা বছর গ্রামবাসীরা মন্দিরে তাদের নিত্যপূজা দিতে আসেন। অঞ্চলটিতে মূলত তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ এবং রাজবংশীরা বসবাস করেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় কতিপয় ব্যক্তি অঞ্চলের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে মন্দিরের কাছেই প্রশাসনের কোন অনুমতি না নিয়েই মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করছে। ফলে অঞ্চলের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট হতে চলেছে। উল্লেখ্য, হালালপুর বাংলাদেশ সীমান্তের খুব নিকটে। ফলে অঞ্চলটি দুষ্কৃতিদের স্বর্গরাজ্য। প্রায়ই এই অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশী জেহাদীরা ভারতে ঢুকে পড়ে। এখান দিয়ে গরু ও জাল নোট পাচার হয়ে থাকে। মসজিদ নির্মাণ হলে তা আগামীদিনে হিন্দুদের পূজাপাঠে বিঘ্ন ঘটাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গ্রামবাসীরা রায়গঞ্জ থানার আই.সি.-কে বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের ডি.এম. ও এস.ডি.ও.-কেও লিখিত অভিযোগের কপি দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার বেআইনি নির্মাণ বন্ধে প্রশাসন কতখানি উদ্যোগ নেয়।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গো-হত্যা বন্ধের আবেদন জানালো হিন্দু সংহতি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জীর কাছে গো-হত্যা বন্ধের লিখিত আবেদন জানালো হিন্দু সংহতি। দুর্গাপূজার দিনগুলো তো বটেই, সার্বিকভাবে গো-হত্যা বন্ধ হোক মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই দাবি।

এ প্রসঙ্গে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে হাইকোর্টের রায়ের কথা বলা হয়। গরুকে হিন্দুরা গো-মাতা রূপে পূজা করে। স্বভাবতই গো-হত্যা হলে সেটা তাদের ধর্মের আঘাত বলেই হিন্দুরা মনে করে। কিন্তু ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোন রাজ্যের হাইকোর্ট ধর্মের কথা চিন্তা করে এই রায় দেননি। গরু একটি অতি প্রয়োজনীয় ও উপকারী প্রাণী। সম্প্রতি গো-হত্যা এবং বিপুল সংখ্যক গরুপাচারের ফলে গরু সংখ্যাতীতভাবে কমে গেছে। বিভিন্ন রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতও এই ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। সেই আদালতের নির্দেশ মেনেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গো-হত্যা বন্ধের আবেদন করা হয়েছে বলে হিন্দু সংহতির রাজ্য সম্পাদক শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্য জানান।

স্কুলে ছাত্রীকে কটূক্তি

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, বেলা বারোটায় আমতা থানার অন্তর্গত বানপুর শশীভূষণ হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে স্কুলের মধ্যে শেখ লালন নামে এক মুসলিম ছাত্র কটূক্তি করে। ছেলেটির বাড়ি চন্দপুর গ্রামে। এই ঘটনায় শুভঙ্কর পালের নেতৃত্বে অন্য ছাত্ররা প্রতিবাদ করলে মুসলিম ছাত্রটি তাদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করে। ফলে সকলে মিলে মুসলিম ছাত্রটিকে মারধোর করে। মার খেয়ে ছেলেটি নিজের গ্রামে ফিরে যায়। এরপর প্রায় ৩০-৪০ জন লোক নিয়ে মুসলিম ছেলেটি মাজুক্ষেত্র গ্রামে শুভঙ্করের বাড়িতে চড়াও হয়। ছেলেটির পরিবার রুখে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরাও খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। উভয়পক্ষের ব্যাপক মারপিট হয়। সংঘর্ষে মুসলিমদের বেশ কয়েকজন আহত হয়। তাদের মধ্যে দু-তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। মাজুক্ষেত্র গ্রামবাসীদের কাছে মার খেয়ে মুসলমানরা জগৎবল্লভপুর থানায় একটা লিখিত অভিযোগ করে। ১৭ জনের নামে কেস হয় (৩৮৩/১৫), ৩৪১, ৩২৫, ৩২৬, ৩৭৯, ৩০৭, ৩৪ আই পি সি-ধারা তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করে। পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

মহিলার শ্লীলতাহানি ঃ জনগণের মারে আহত দুষ্কৃতি

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত আঁইয়া পঞ্চায়েতের শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের তপশিলী সম্প্রদায়ের এক গৃহবধূ সাগরী ধাড়া (স্বামী প্রশান্ত ধাড়া) গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বিকাল তিনটের সময় মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিল। তখন মাধবপুর গ্রামের (বেগমপুর পঞ্চায়েত, চণ্ডীতলা থানা) শেখ কুতুবউদ্দিন তার বন্ধুর সঙ্গে বাইকে করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। একা সাগরী দেবীকে দেখে বাইক থামিয়ে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কুতুবউদ্দিনরা এগিয়ে যায়। ভয়ে সাগরী ধাড়া পালাতে গেলে তার শাড়ির আঁচল ধরে টানাটানি করে দুষ্কৃতিরা। কোনমতে তাদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে সাগরী গ্রামের লোকজনকে খবর দেয়। গ্রামের লোক এসে কুতুবউদ্দিন সহ তার বন্ধুকে ধরে ফেলে। বন্ধু কোনমতে হাত ছেড়ে পালালেও বেদম মারে কুতুবউদ্দিন অচৈতন্য হয়ে পড়ে। পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা মিলে কুতুবউদ্দিনের নামে থানায় একটি কেস দায়ের করে। (এফ আই আর নং ৩৪৭/১৫)। কুতুবউদ্দিনের বিরুদ্ধে ৩৫৪ ও ৫০৯ ধারা দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু সংহতির কর্মীর প্রচেষ্টায় গৃহবধূ উদ্ধার

নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অন্তর্গত নুপুরগাছি গ্রামের বাসিন্দা সবিতা সরকার (স্বামী ভবেন সরকার)। গরিব এই খেতমজুর পরিবারের এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে কষ্টের সংসার। নিত্যদিন ভালো করে আহার জোটে না। এই সুযোগটাই কাজে লাগায় ঐ গ্রামের ইসলাম আলি (পিতা রসুল আলি মন্ডল)। গত ১১ই সেপ্টেম্বর ইসলাম সবিতাকে নিয়ে পালায়। মুর্শিদাবাদের জামালপুরে তার বোনের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সবিতার স্বামী এলাকার হিন্দু সংহতির কর্মীদের কাছে সমস্ত খুলে বলে ইসলাম কোথায় আছে তা জানায়। সেইমতো রবিবার হিন্দু সংহতির কর্মী পাঁচু মন্ডলসহ ৭ জন লোক মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ইসলামের বোনের বাড়িতে তারা সবিতাকে খুঁজেও পায়। কিন্তু ইসলামের পরিবারের লোকজন সবিতাকে ছাড়তে চায়নি। শেষে এক বৃদ্ধ মৌলবীর মধ্যস্থতায় সবিতাকে তারা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সেইদিনই সবিতাকে তার গ্রামের বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়। এখন সে ঠিকমতো স্বামীর ঘর করছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

মুখ্যমন্ত্রীকে হিন্দু সংহতির চিঠি ঃ পঞ্চস্বরে সোচ্চার ইসলামী দুনিয়া

মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া ''হিন্দু সংহতির'' চিঠি বড়সড় বিতর্কের সৃষ্টি করল। প্রসঙ্গত গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্যের দেওয়া চিঠিতে দুর্গাপুজোর চারদিন ১৯-২২শে অক্টোবর সারা রাজ্যজুড়ে গোমাংস বিক্রি বন্ধের দাবি জানানো হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ''হিন্দু সংহতি''র এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন। বিজেপি-র সংখ্যালঘু সেলের প্রধান শাকিল আনসারি বলেন, ''তারা পাগল হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। এটা বিজেপি করেনি।'' তিনি আরও বলেন, হিন্দু সংহতির এই অদ্ভুত দাবী নিয়ে তিনি রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাহুল সিনহার সঙ্গে কথা বলবেন। সিপিআই (এম) নেতা মহম্মদ সেলিম এই ঘটনায় আর এস এস-এর ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ''এইসব ঘটনা রাতারাতি হয় না। সংঘ পরিবার দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংস করতে চায়। এইসব কাজ বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারের উচিত দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া।'' মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছের মানুষ সৈয়দ মহম্মদ নুরুল রহমান বরকতিও (ইমাম, টিপু সুলতান মসজিদ, কলকাতা) এইরকম প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেওয়ার কথা বলেন।

মিল্লি ইৎওহাদ পরিষদের সভাপতি আব্দুল আজিজ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''যদি মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু সংহতির দাবি মেনে নেন, তবে উনাকে ২০১৬-র লোকসভা নির্বাচনে এর ফল ভুগতে হবে।''

গো-মাংস তুলতে রাজি হল না অটোচালকরা

দীর্ঘদিন ধরে ধূলাগড় থেকে ডোমজুড় পর্যন্ত প্রায় শতাধিক অটো চলাচল করে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, বকরি ঈদের দিন মুসলমানরা জবাই করা গরুর মাংস নিয়ে অটোয় উঠতে গেলে অটোচালকরা তাদের নিতে অস্বীকার করে। তারা বলে, গাড়িতে গরুর মাংস তুলবে না। এ নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে কয়েকজন অটোচালকের বচসাও হয়। এর জেরে সমস্ত অটোচালক সেদিনকার মতো রুট থেকে অটো তুলে নেয়। পরদিনও তারা অটো চালাতে রাজি হয়নি। এতে নিত্যযাত্রীরা অসুবিধায় পড়ে। শেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে অটোচালকেরা রুটে গাড়ি বের করে।

হাজী বিরিয়ানীর দোকান বন্ধ করল স্থানীয় মানুষ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গাইঘাটা বাজারে হাজী বিরিয়ানীর দোকান করতে দিল না স্থানীয় লোকেরা। গতকাল গাইঘাটা বাজারে হাজী বিরিয়ানীর স্টল খোলার কথা ছিল। কিন্তু খবর পাওয়ার সাথে সাথে প্রায় ২০০ জন যুবক বাজারে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানায়। তাদের শর্ত ছিল (১) বিরিয়ানীর দোকান হতে পারে কিন্তু হাজী বিরিয়ানী চলবে না এবং (২) বিরিয়ানীর মাংস বাইরের কোনো জায়গা থেকে আনা যাবে না, স্থানীয় দোকান থেকেই কিনতে হবে। প্রাথমিকভাবে দোকানের মালিক স্থানীয় মানুষদের এই দাবী মানতে রাজি হয়নি। এতে সাধারণ মানুষ বিরিয়ানির দোকান করা যাবে না বলে স্পষ্টভাবে দোকান মালিককে জানিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত স্টলের মালিক স্থানীয় যুবকদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

হনুমান মন্দির নির্মাণ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের বুড়োর ঘাট তিনমাথার মোড়ে নবনির্মিত হনুমান মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হল। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে মন্দিরের কাজ চলছিল। প্রাথমিকভাবে এলাকার মুসলিমরা নির্মাণ কাজে বাধা দেয়। বেশ কয়েকবার নির্মাণ কার্যকে নিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে এলাকাবাসীর বচসা হয়। বেশ কয়েকবার মারামারি হওয়ার উপক্রমও হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু সংহতির স্থানীয় কর্মীরা মন্দির নির্মাণ কাজে হাত দিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা আর বিশেষ বাধার সৃষ্টি করেনি। দ্বারোদ্ঘাটনের দিন এলাকার বহু মানুষ মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। এই মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে ঐ গ্রাম ও চারপাশের অন্যান্য গ্রামেও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর মন্দিরবাজার থানার কানেড়া গ্রামে খুব জাঁকজমক করে মহাবীর হনুমানের পূজা করা হয়। স্থানীয় হিন্দু সংহতির ছেলেরা ঐ পূজার আয়োজন করে। পুজো উপলক্ষে গ্রামবাসীদের খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়েছিল। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ঐ গ্রামের স্কুল মাস্টার পূজা প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজকুমার সরদার পূজাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হিন্দু সংহতির কর্মীদের উপরেই রয়েছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

মন্দিরে গো-মাংস ঃ এলাকায় উত্তেজনা

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার ১নং ঢোঁড়াবাগদা গ্রামে মুসলমানেরা যমরাজ ও সাবিত্রী-সত্যবান মন্দিরে প্লাস্টিকে করে গরুর মাংস ফেলে গেল। খবর পেয়ে গ্রামের প্রায় হাজার খানেক হিন্দু উত্তেজিত হয়ে পড়লে ও.সি. শুভেন্দু সরকার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। দুষ্কৃতিদের শাস্তির দাবী করে তাঁর কাছে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়। বেগতিক দেখে মুসলমানেরা তাদের দুটি নাবালিকা মেয়েকে, যাদের বয়স ১৪/১৫, তাদেরকে এরজন্য দায়ী করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চায়। কিন্তু হিন্দুরা তাতে শান্ত হয়নি। গ্রামবাসীরা হিন্দু সংহতিকে খবর দিলে অঞ্চলের প্রমুখ কর্মী রাজকুমার সরদার ঘটনাস্থলে যান। তার উপস্থিতিতে হাজার বারোশো লোকের মিটিং হয়। রাজকুমার এর প্রতিকারের ব্যবস্থার কথা বললে গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পরে কুলতলি থানার ওসি শুভেন্দুবাবু দোষীদের ধরে শাস্তি দেবেন বললে গ্রামবাসী কিছুটা শান্ত হয়। এখন পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেয়, তাই দেখার। রাজকুমার সরদার বলেন প্রশাসন দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

ঐ একইদিনে মা লক্ষ্মী ও জগন্নাথদেবের বিগ্রহে পিতলের ডালায় গো-মাংস প্রসাদ রূপে দিয়ে গেল মুসলমানেরা। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার জালাবেড়িয়া ২নং পঞ্চায়েতে কেওড়াখালি গ্রামে। মন্দিরের পুরোহিত ৬টার সময় পূজা করতে এসে দৃশ্যটি দেখতে পান। খবর পেয়ে হিন্দুরা জড়ো হলে কুলতলি থানার ওসি শুভেন্দু সরকার এবং সি আই জয়দীপ ব্যানার্জী বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কারণ জালাবেড়িয়ার হিন্দুরা এই অপমান মেনে না নিয়ে মারমুখী হয়ে ওঠে। দাঙ্গা হবার ভয়ে পুলিশ হিন্দুদের লিখিত অভিযোগ দিতে বলে এবং দোষীদের ধরে শাস্তি দেওয়ার কথাও বলে।

রাজকুমার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে হিন্দুরা তাকে সব কথা বলে। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা প্রশাসনকে বলা হয়েছে। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

লাভ জেহাদের ফাঁদে ফেলে মেয়ে পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল হিন্দু সংহতি

অসানসোলের স্কুলছাত্রী অনিতাকে ভালোবাসার ছলনায় ফুসলিয়ে নিয়ে পুণে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল আবিদ হোসেন। এই কাজে আবিদ হোসেন পারদর্শী। এর আগে আরও দু'টি মেয়েকে সে গায়েব করেছে বলে অভিযোগ। এবার আর পারল না। অনিতার বাড়ির লোকেরা হিন্দু সংহতির স্থানীয় কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করলে সংহতির পক্ষ থেকে পুণেতে যোগাযোগ করা হয়। খবর পাওয়ার সাথে সাথে পুণের কয়েকজন হিন্দুত্ববাদী যুবক সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মেয়েটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

১লা সেপ্টেম্বর সকালে কামাক্ষ্যা পুণে এক্সপ্রেস পুণে স্টেশনে পৌঁছানোর সাথে সাথে স্থানীয় হিন্দু যুবকেরা দু'জনকে আটক করে রেল পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ওই দু'জনকে রিসিভ করার জন্য আরও চারজন দুষ্কৃতি এসেছিল স্টেশনে। তাদেরকেও আটক করা হয়। পরে বাড়ির লোকেরা পুণে পৌঁছালে অনিতাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686

হিন্দুর ঠাকুর

আমার ঠাকুর অস্ত্রধারী।
আমার ঠাকুর যোদ্ধা।।

দুর্বলেরা হিন্দু না
হতেও পারে বোদ্ধা।

আমার ঠাকুর যুদ্ধ করে—
পুরুষ হোক বা নারী।
আমি হিন্দু, এমনিতে তাই—
যোদ্ধা হতে পারি।

আমি হিন্দু - রক্তবিন্দু
ভগবানের দান।
আমার লক্ষ্য—
অসুর মুক্ত আমার হিন্দুস্থান।।

আমাদের সংকল্প

- হিন্দুস্থান থেকে হিন্দুদের স্থানচ্যুত হতে দেব না।
- হিন্দুর উপর অন্যায়, অত্যাচার ও অপমান মেনে নেব না।
- হিন্দু মা-বোনের সম্মান প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।
- হিন্দু কন্যাদের আমাদের ধর্মের বাইরে হারিয়ে যেতে দেব না।
- আমাদের দেব-দেবী ও মন্দির প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।
- হিন্দুর জনসংখ্যা কমতে দেব না।
- বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দেব না।

মূল্য ঃ ১৬.০০ টাকা মাত্র